দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৭ ঈসায়ী

ইসলামের ইতিহাস আর্কাইভ-২০১৭

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৭ ঈসায়ী

সূচিপত্র

কখনো কখনো একটি ছোট মেয়েও সতীত্ব এর মর্যাদা বুঝিয়ে দেয় অথচ অনেক মহিলা সেটার মর্যাদা হারিয়ে দেয়..!..... ৪

হায়দ্রাবাদ গণহত্যা এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনা... ..... ৫

পূর্ব তুর্কিস্তান যেভাবে 'জিনজিয়াং' হলো★ ১৫

নবিপ্রেমে সহাস্যবদনে জীবনোৎসর্গকারী তরুণ..... ২৩

গাজি ইলমুদ্দিন শহিদ রহ. : সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য মাওলানা আলী হাসান উসামা ২৩

এক জীবন্ত শহীদের গল্প {না শুনলে চরম মিস করবেন}..... ৩৯

একাত্তরের ইতিহাসঃ অধ্যায়- ১০০ঃ মুক্তিযুদ্ধে ইসলাম শূণ্যতা।..... ৪২

একাত্তরের ইতিহাসঃ অধ্যায়ঃ ১৭- ভারতীয় ' র ' এবং 'সি আই এ ' এর ভূমিকা..... ৫৯

কখনো কখনো একটি ছোট মেয়েও সতীত্ব এর মর্যাদা বুঝিয়ে দেয় অথচ অনেক মহিলা সেটার মর্যাদা হারিয়ে দেয়..!

HIND_AQSA

Senior Member

০৪-২২-২০১৭

শায়খ আবু মোহাম্মদ আল মাকদিসি (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ

"আমার ১১ বছরের মেয়ে মারিয়া, সে আমার সাথে দেখা করার জন্য জেলে এসেছিল. সুতরাং মহিলা প্রহরী যে মহিলাদের উপর তল্লাশি করে, সে আমার মেয়েকে জিলবাব (এক ধরনের বোরকা যা একজন মহিলাকে পুরোপুরি ঢেকে রাখে) খুলতে বলেছে এবং তল্লাশি করতে চেয়েছে এক প্রকার অপমানকর এবং লজ্জাহীন পদ্ধতিতে. সুতরাং মারিয়া তার এই ধরনের তল্লাশিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং সে আমার সাথে দেখা করার ইচ্ছা বাদ দেয়".

সে অতঃপর একটি কবিতার কিছু অংশ বলে, যা সে বলেছিলঃ

إن شئت أنتِ فارفعيه أو اخلعيه . أما أنا فإلى الممات سأرتديه.

যার অর্থ হলঃ

"হে জেলের মহিলা প্রহরী তুমি যদি ইচ্ছা কর, তুমি হয়ত তোমার জিলবাব খুলবে. কিন্তু আমার জন্য, আমি এটা পরিধান করবো আমার মৃত্যু পর্যন্ত কেননা এটা হল আমার সতীত্বর প্রতীক".

বই "হে আমার মারিয়া তাকে বল", পৃষ্ঠা ১

কখনো কখনো একটি ছোট মেয়েও সতীত্ব এর মর্যাদা বুঝিয়ে দেয় অথচ অনেক মহিলা সেটার মর্যাদা হারিয়ে দেয়..!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৩৯১

হায়দ্রাবাদ গণহত্যা এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনা...

Abu Khubaib

Senior Member

০৫-১৫-২০১৭

১৯৪৭ সালের মুসলিমদের চূড়ান্ত রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার ফলাফল হিসেবে বিশাল ভূখন্ড চলে যায় হিন্দুদের হাতে। নিষ্পেষিত, ক্লান্ত মুসলমানেরা ***পাকিস্তান*** *নামক 'ইসলামী' ভূখণ্ড পেয়েই আবেগাপ্লুত হয়ে পরে। কাশিম নানুতবি, শাহ আব্দুল আজিজ, সাইয়িদ আহমাদ শাহিদ (রাহিমাহুমুল্লাহ) দের উত্তরসূরিরা দায়িত্ব পালন হয়েছে বলে সিদ্ধান্তে উপনীত হোন। ২০০ বছর পরাধীন থাকার পর এটাকে বিজয় ব্যাতিত অন্য কোনো কিছু আখ্যায়তি করতে এখনো নারাজ অসংখ্য অজস্র দেওবন্দি উলামায়ে কেরাম।*

কিন্তু ! দেশভাগের সময় হায়দ্রাবাদের স্বাধীন মুসলমানেরা এমনটা মেনে নিতে পারেনি। হিন্দুদের কাছে নিজেদের ভূমি বিলিয়ে দেয়ার মত আপোসকামী হতে পারেনি হায়দ্রাবাদের স্বাধীন মুসলমানরা। পরাধীন থাকতে না চাওয়ার দরুন হিন্দুদের হাতে গণহারে মারা পরে হায়দ্রাবাদের লক্ষাধিক মুসলমান। আল্লাহ্ *তা'আলা তাদের সবাইকে কবুল করে নিন। আমীন।*

এতদিন পর্যন্ত হায়দ্রাবাদের মুসলমানদের আমি বরাবরই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, নির্ভীক ও সত্যাবাদী হিসেবে অনুকরণীয় হিসেবেই জেনে এসেছি।

কিন্তু হায়! গত বছর মার্চ মাসে যখন রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বাতিল হওয়ার রিটের শুনানি এগিয়ে আসছিল তখন, একজন প্রথিতযশা দেওবন্দি আলিমকে যখন সাধারণ তালিবুল ইলম ও মুসলমানরা জিজ্ঞাসা করছিল রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বাতিল হলে উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে দারুল হারব ফতোয়া আসবে কি না।

উত্তরে সেই কওমি আলিম হায়দ্রাবাদের মুসলমানদের অদূরদর্শী আখ্যায়িত করে সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ (!!) করে এহেন চিন্তা-ভাবনা মুছে ফেলতে বলেন !! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এছাড়াও, হায়দ্রাবাদ গণহত্যা চলাকালীন ও পরবর্তী সময় থেকে এখন পর্যন্ত উলামায়ে কেরামের আশ্চর্য নিরবতা যথেষ্ট আশ্চর্যজনক!

আজ আমাদের অবস্থা তো সেই বনি ইসরায়েলিদের মত যারা পরাধীন থাকতে থাকতে স্বাধীনতাকেই ঘৃণা করা শুরু করেছিল। আজ আমরা সেই ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের অন্ধের মত অনুসরণ করে যাচ্ছি, কর্মে ও মননে উভয় ক্ষেত্রেই সেটা জেনে হোক বা না জেনেই হোক।

এর কারণ আমরা ইহুদি-খ্রিস্টানদের আইন, নীতি-নৈতিকতা, শিক্ষাব্যবস্থাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করলেও এই সমাজে বসবাস করতে গিয়ে সেগুলোর ভেতরই ডুবে আছি। হাতে গোণা কয়েকজন আলিম ব্যাতিত এলাকার এস এস সি পরীক্ষার্থীদের জন্য বরকতের দু'আ করেন নি এমন আলিম খুজে পাওয়া ভার বৈ কি।

হযরত আবু সাঈদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ইরশাদ করেছেন," তোমরাও তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের পদাংক অনুসরণ করবে। একেবারে পায়ে পায়ে। তারা যদি গুইসাপের গর্তে ঢুকে থাকে তাহলে তোমরাও ঐ গর্তে ঢুকে ছাড়বে।" [বুখারী ও মুসলিমের সূত্রে মিশকাত শরীফঃ ৪৫৮ পৃঃ]

কুফরতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভেতর আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকার কারণেই তো, হায়দ্রাবাদের স্বাধীন মুসলমানদের মত আত্মমর্যাদার মৃত্যুর তুলনায় ভিখারীর মত বেচে থাকাই আমাদের কাছে অধিক পছন্দনীয়।

<u>নিচে হায়দ্রাবাদের ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো। মূল লেখাটি লিখেছেন ভাই সাজিদ করিম।</u>

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার সময় ৫০০ এর বেশি ছোট ছোট রাজ্য ছিল (যাদেরকে বলা হত প্রিন্সলি স্টেট)।তাদের একেক জনের সাথে বৃটিশের একেক শর্ত ছিল।বৃটিশরা সবাইকে এদের অধীনে নিয়ে এসেছিল কিন্তু বাংলার মত দখল করেনি। স্বাধীনতার সময় তাঁদের বলা হল; হয় ভারতে যোগ দাও, না হয় পাকিস্তানে অথবা নিজেরাই স্বাধীন থাক।

হায়দ্রাবাদ, কাশ্মির,সিকিম সহ কিছু রাষ্ট্র নিজেরাই স্বাধীন থাকতে চেয়েছিল, হয়েছিলও কিছু দিনের জন্য।

কিন্তু ভারত একে একে সবাইকেই বিভিন্ন অজুহাতে দখল করে নেয়।কারো ক্ষেত্রে বলা হল (যেমন হায়দ্রাবাদ) মুসলমান শাসক কর্তৃক নির্যাতিত হিন্দুদের বাঁচাতে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রবেশ করেছে। অথচ ২০০ বছরেরও বেশী সেখানে

মুসলমান শাসক ছিল এবং রাজ্যটি ছিল সবদিক দিয়ে সমৃদ্ধ।কাশ্মিরের ক্ষেত্রে বলা হল কাশ্মিরের রাজার সাথে তাঁদের গোপন চুক্তি ছিল যেখানে দ্বিপাক্ষিক সামরিক সহযোগিতার কথা ছিল, যে চুক্তি আজ অবদি কেউ দেখেছি। এই ধরণের অজুহাতে ভারতীয় সেনা দেশগুলোতে প্রবেশ করেছিল, আর বের হয়নি।আমাদের দেশেও সংখ্যালঘু নির্যাতনের ধুয়া তোলা হচ্ছে ইদানিং।

এইসব রাষ্ট্র দখল করতে এবং দখল বজায় রাখতে ভারত কতটা নির্মম অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছে, চালাচ্ছে সেটা অবর্ণনীয়।ভারত কাশ্মিরকে ভারতের অংশ দাবী করা সত্ত্বেও রেকর্ড মতে শুধু কাশ্মিরেই ৯০,০০০০ এর উপর মানুষ হত্যা করেছে, ধর্ষণ করেছে অগনিত।যারা রেকর্ড হয়নি তাদের কথাতো বাদ।'নিজের দেশের' এত মানুষকেই যারা হত্যা করতে পারে তাঁরা অন্যদেশে কি করতে পারে সেটা সহজে অনুমেয়।

অন্যান্য আরো কারনের সাথে ভারতীয়দের ইতিহাসে এমন আধিপত্যবাদী মানসিকতার কথা ভেবেই হয়ত তৎকালীন পুর্ব-বংগের মুসলিম নেতারা ১২০০ মাইল দুরের অচেনা পাঞ্জাবী পাঠানের সাথে গেল (অন্যান্য কারণগুলো জানতে পড়তে পারেন নুরুল কবীরের লেখা ; বাঙ্গালী মুসলমান কেন হাজার মাইল দূরের পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে গেল?) ।তারা হয়ত ভেবেছে পাঞ্জাবীরা আমাদের সাথে গাদ্দারী করলে তাদের থেকে বের হয়ে আসা যাবে।কিন্তু একবার ভারতের পেটে ঢুকে গেলে পরিণতি হত হয় কাশ্মির, আসাম, সিকিম অথবা হায়দ্রাবাদের। পড়ুন হায়দ্রাবাদের দখলে গনহত্যার কথা।

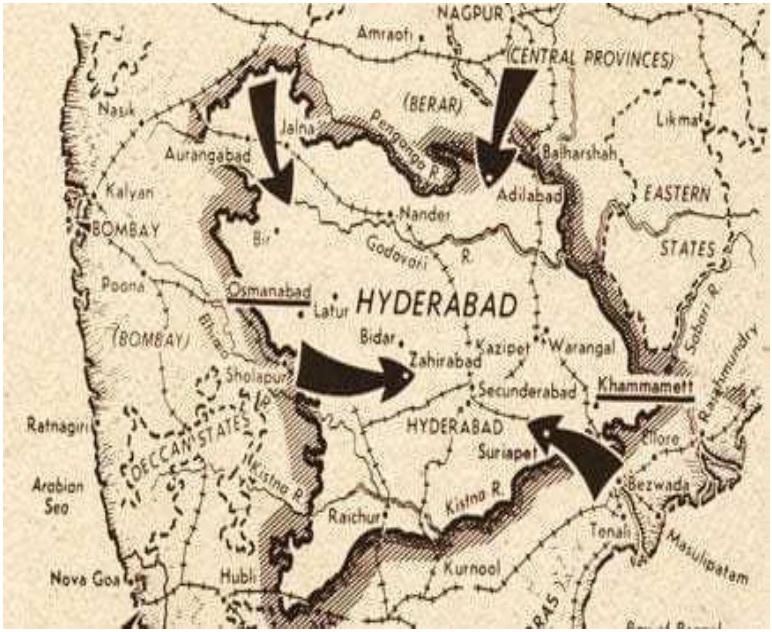

.....

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্লান্ত ব্রিটেন সিদ্ধান্ত নিল তারা ভারত উপমহাদেশের শাসনভার ছেড়ে দেবে। সরাসরি ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশগুলোর কেউ পাকিস্তানে গেল, আর কেউ ভারতের সঙ্গে রইল। এছাড়াও ভারতে অনেকগুলো রাজ্য ছিল যেগুলো ব্রিটিশদের দ্বারা নয় বরং অনেকটা স্বাধীন রাজা দ্বারা শাসিত হত(উদাহরণস্বরূপ কাশ্মীর, যা হিন্দু মহারাজা হরি সিং কর্তৃক শাসিত হত)।

এ সকল রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে ধনী ও শক্তিশালী ছিল হায়দ্রাবাদ রাজ্য। হায়দ্রাবাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী, এয়ারলাইন্স, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও মুদ্রা ছিল। ছিল অভ্যন্তরীণ রেল যোগাযোগ ব্যাবস্থা। জনসংখ্যা ছিল দেড় কোটিরও বেশী আর আয়তন বাংলাদেশের দেড়গুণ। হায়দ্রাবাদের তৎকালীন নিযাম-উল-মুলক উসমান আলি খান ছিলেন সে সময়ে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি।

ভারত বিভাগের সময় ব্রিটিশ সরকার কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদসহ সকল স্বাধীন রাজ্যকে তিনটির মধ্যে যে কোন একটি বেছে নিতে বলেছিল; হয় ভারতের সাথে একীভূত হওয়া, কিংবা পাকিস্তানের সাথে নতুবা দুটোর বাইরে স্বাধীন থাকা। নিযাম উসমান আলি খান শেষেরটি বেছে নিলেন। ভারতের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ প্রমাদ গুনলো। ভারতের ঠিক মধ্যখানে একটি স্বাধীন মুসলিম শাসনাধীন রাজ্য তাদের কাছে

দুঃস্বপ্নের মত মনে হল। শাসকের আসনে মুসলিমরা থাকলেও হায়দ্রাবাদের মোট জনসংখ্যার ৮৫% ছিল হিন্দু। হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতারা তাই হায়দ্রাবাদ দখল করতে মাঠে নেমে পড়লেন।

যুদ্ধ হল শুরু

উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী দলগুলোর ইন্ধনে হায়দ্রাবাদের অভ্যন্তরে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে মুসলিম জমিদার ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের গুপ্তহত্যা শুরু হয়। এক হিসাব মতে প্রায় দুই হাজার ব্যক্তি তাদের হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। এ পরিস্থিতিতে নিযাম স্থানীয় যুবকদের নিয়ে গঠিত রাজাকারদের (বাংলায় যার অর্থ হয় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী) দায়িত্ব দেন হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধের। রাজাকারেরা কমিউনিস্টদের পাকড়াও অভিযান শুরু করে, অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। কমিউনিস্টরা সবাই ছিল হিন্দু, সুতরাং এ সুযোগকে কাজে লাগাল ভারত সরকার। বহুল প্রতীক্ষিত হায়দ্রাবাদ দখলের অজুহাত এখন তাদের হাতে; তারা প্রচার করলো উগ্র মুসলিম রাজাকারেরা পাইকারী হারে হিন্দুদের হত্যা করছে।

নিযাম-উল-মুলক উসমান আলি খান তার পরিষদের সাথে, ছবিটি ১৮৯৯ সালে নেয়া (সৌজন্যে বিবিসি)

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালে 'অপারেশন পোলো' সাংকেতিক নামে ভারতীয় সেনাবাহিনী চারদিক থেকে হায়দ্রাবাদ আক্রমণ শুরু করে। বিশ্বের কেউ সেদিন হায়দ্রাবাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। লক্ষাধিক ভারতীয় সৈন্যের বিপরীতে হায়দ্রাবাদের ট্রেনিংপ্রাপ্ত প্রফেশনাল সৈন্যের সংখ্যা ছিল মাত্র ছয় হাজার, তাদের সাথে ছিল আর বিশ হাজার রাজাকার বাহিনী। এ অসম লড়াইয়ে চারদিন প্রতিরোধ করে অবশেষে পরাজয় মানে হায়দ্রাবাদ বাহিনী। ১৭ সেপ্টেম্বর সকালে সিকান্দারাবাদে ভারতীয় মেজর জেনারেল জয়ন্ত নাথ চৌধুরীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন হায়দ্রাবাদের সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল সাইয়েদ আহমেদ এল এদরুস। স্বাধীনতা হারিয়ে হায়দ্রাবাদ ভারতের একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

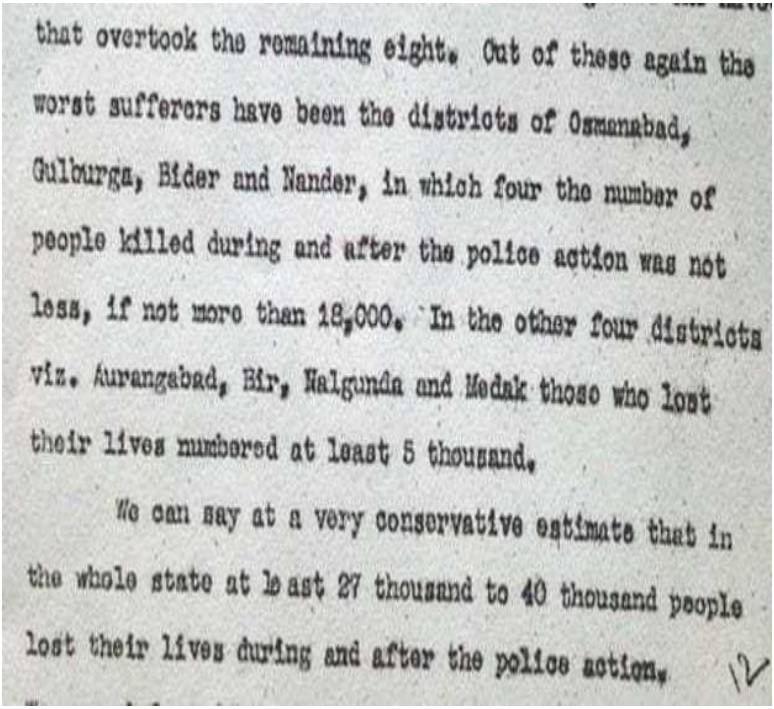

that overtook the remaining eight. Out of these again the worst sufferers have been the districts of Osmanabad, Gulburga, Bider and Nander, in which four the number of people killed during and after the police action was not less, if not more than 18,000. In the other four districts viz. Aurangabad, Bir, Nalgunda and Medak those who lost their lives numbered at least 5 thousand.

We can say at a very conservative estimate that in the whole state at least 27 thousand to 40 thousand people lost their lives during and after the police action.

সুন্দরলাল রিপোর্ট

হায়দ্রাবাদ দখলের পরপরই গণহত্যার খবর আসতে থাকে। আবার ভারতজুড়ে মুসলিমদের গণঅসন্তোষের ভয়ে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু কংগ্রেসের সংসদ সদস্য পন্ডিত সুন্দরলালের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন যাতে হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মেরই সদস্য ছিল। এ কমিটি হায়দ্রাবাদ ঘুরে এসে তাদের রিপোর্ট জমা দেয় যা সুন্দরলাল রিপোর্ট নামে পরিচিত। নেহেরু থেকে শুরু করে মনমোহন পর্যন্ত, ভারত সরকার এ রিপোর্ট সম্পর্কে গোপনীয়তা বজায় রেখেছে। গণহত্যার বিষয়ে বহির্বিশ্ব ও ভারতের জনগণকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়। সর্বশেষে ২০১৩ সালে দিল্লীর নেহেরু স্মৃতি জাদুঘরে এ রিপোর্ট জনসম্মুখে আসে। কমিটির মতে, খুব কম করে ধরলেও ২৭০০০ থেকে ৪০,০০০ মানুষ নিহত হয়েছিলেন।

যদিও এ জি নুরানি ও অন্যান্য গবেষকদের মতে এ সংখ্যা দুই লাখ বা তার থেকেও বেশী। কমিটির রিপোর্টে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতীয় সেনাবাহিনী এ সকল গণহত্যায় সরাসরি জড়িত ছিল।

"বেশ কয়েক জায়গায়, সামরিক বাহিনীর সদস্যরা শহর ও গ্রাম থেকে মুসলিম পুরুষদের ধরে নিয়ে এনে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করেছে।" সেনাবাহিনী মুসলিম পুরোপুরি নিরস্ত্র করলেও হিন্দুদের তো নিরস্ত্র করা হয়ইনি বরং সেনাবাহিনী উৎসাহিত করেছে আর কিছু ক্ষেত্রে বাধ্য করেছে স্থানীয় হিন্দুদের, মুসলিমদের বাড়িঘর ও দোকানপাট লুটপাট করার জন্য। সুন্দরলাল রিপোর্টের সাথে পেশ করা একটা গোপনীয় নোটে হিন্দুদের রক্তলোলুপ এই চরিত্রের এক জঘন্য নমুনা দেখা যায়।

১৯৪৮ হায়দ্রাবাদ গণহত্যায় মুসলিমদের ধরপাকরের দৃশ্য

"অনেক জায়গায় আমাদের দেখানো হয় কুয়া যেগুলো ছিল পচা লাশে ভরা। এ

রকম এক ক্ষেত্রে আমরা ১১ টি লাশ দেখেছি যার মধ্যে ছিল একজন মহিলা যার ছোট শিশুটি তার স্তনের সাথে লেগেছিল।"

"দেখেছি ডোবা-নালার মধ্যে লাশ ছড়িয়ে আছে। বেশ কয়েক জায়গায় দেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল; আমরা গিয়ে দেখেছি পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া হাড় আর খুলি এখনও সেখানে পড়ে আছে।"

শুধু হত্যা আর লুটই নয়, অসংখ্য মুসলিম মহিলা সশস্ত্র হিন্দু মিলিশিয়াদের হাতে ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন। মুহাম্মাদ হায়দারের ভাষায়, " হাজার হাজার পরিবার ভেঙ্গে গিয়েছিল, শিশুরা তাদের পিতামাতার কাছ থেকে আর স্ত্রীরা তাদের স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। মহিলা ও তরুণীদের ধাওয়া করা হত আর ধর্ষণ করা হত"।

যাদের সামর্থ্য ছিল তারা পাকিস্তানে হিজরত করেছিলেন। জাতিসঙ্ঘ ও মানবাধিকার তখন অন্ধ ছিল। বিশ্বের "সর্ববৃহৎ গনতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে" এ অপরাধের জন্য কাউকে শাস্তি পেতে হয়নি, কারো বিচার হয়নি বরং এর দৃশ্যায়ন আবার ঘটেছিল গুজরাটে।

.....

"হায়দারাবাদ : একটি মুসলিম ট্র্যাজেডি" শীর্ষক এক প্রবন্ধে অধ্যাপক উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য উল্লেখ করে লিখেছেন, "যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর মুসলমানরা (গণহারে) ব্যাপক আঘাত ও পাশবিক হামলার শিকার হয়। ধ্বংসযজ্ঞের পর যারা বেঁচে ছিলেন তারাও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। তাদের হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হয় এবং উচ্ছেদ করা হয় কয়েক লাখ মানুষকে। মুসলিম বাহিনীর সহযোগীদের কথিত সহিংসতার প্রতিশোধ নেওয়ার অজুহাত দেখিয়েই এইসব নারকীয় অভিযান চালানো হয়েছিল। (১৯৫০ সালে প্রকাশিত 'দ্য মিডল-ইস্ট জার্নাল', খণ্ড-৪) [হায়দারাবাদ পতন : এক গোপন সত্যের সন্ধানে, নূরুর রহমান, ১০ অক্টোবর ২০১৩, সাম্প্রতিক দেশকাল]

রেফারেন্স এবং প্রাসঙ্গিক পোস্টঃ

Pandit Sundarlal Committee Report on the Massacres in Hyderabad (১৯৪৮)

Hyderabad ১৯৪৮: India's hidden massacre-BBC report
হায়দ্রাবাদ ১৯৪৮ : ভারতের গোপন গণহত্যা– যুগান্তর , ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩

একটি জাতির স্বাধীনতা খোয়ানোর কষ্টঃ লেন্দুপ দর্জি ও সিকিমের ভাগ্য

স্বাধীন ভারতে কেমন আছে সংখ্যালঘু মুসলিমরা?

إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ

"যখন আমরা কোন সম্প্রদায়ের নিকট পৌছি যুদ্ধের জন্য, এটি তাদের জন্য দুর্বিষহ সকাল যাদেরকে পূর্বে সতর্ক করা হয়েছিল।"(সহিহ বুখারি, ৩৭১)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৭৭৫

পূর্ব তুর্কিস্তান যেভাবে 'জিনজিয়াং' হলো★

শামিল বাসায়েভ

Junior Member

০৫-৩১-২০১৭

****

মধ্য এশিয়ায় চীনের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের জিনজিয়াং প্রদেশটি আয়তনের দিক দিয়ে পুরো দেশের ৬ ভাগের এক ভাগ। এটি চীনের সবচেয়ে বড় প্রদেশ। আয়তন ৬ লাখ ৪০ হাজার ৯৩০ বর্গমাইল।

প্রায় দেড় হাজার বছর যাবত এখানে মুসলিমরা স্বাধীনভাবে বাস করে আসছে। কিন্তু বিশ শতকের মধ্যভাগে এসে কমিউনিস্ট চীন এ অঞ্চলকে নিজেদের করায়ত্ব করে নেয়। তারপর থেকে চীনারা সবদিক দিয়ে মুসলিমদের ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করে ইসলামের ঐতিহ্য ও প্রাচীন নিদর্শনাবলী একের পর এক ধ্বংস করে দিচ্ছে। আর এ সমস্ত কর্ম-কাণ্ড বহির্বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে আড়াল করে রাখছে চীন। হান চীনাদের অত্যাচারে ওখানকার মুসলিমদের জীবনাচার অত্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করছে। কমিউনিস্ট সরকার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এ অঞ্চলটির 'তুর্কিস্তান' নাম পরিবর্তন করে রেখেছে 'জিনজিয়াং'।

★অবস্থান ও পরিচিতি:

বর্তমানে মধ্য এশিয়ায় তুর্কি জাতিসমূহ অধ্যুষিত অঞ্চলকে তুর্কিস্তান বলা হয়। এর মধ্যে রয়েছে আধুনিক তুর্কমেনিস্তান , কাজাখস্তান ,উজবেকিস্তান , কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান ও চীনের জিনজিয়াং (চীনা তুর্কিস্তান)। অনেকে রাশিয়ার তুর্কি

অঞ্চলসমূহ যেমন তাতারস্তান ও সাইবেরিয়ার কিছু অংশকে তুর্কিস্তানের অংশ হিসেবে বিবেচনা করে থাকে।

যেহেতু অঞ্চলটির পরিধি অনেক ব্যাপক, তাই একে পূর্ব ও পশ্চিমে ভাগ করে পূর্ব তুর্কিস্তান ও পশ্চিম তুর্কিস্তান নামে অভিহিত করা হয়। চীন যে অংশটি দখল করে রেখেছে, তা হলো পূর্ব তুর্কিস্তান। আর পশ্চিম তুর্কিস্তান অতীতে স্বাধীন থাকলেও একসময় ইহা সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলে ছিলো।

৯০ এর দশকে রাশিয়ার পরাজয়ের পর দখলকৃত অধিকাংশ ভূখণ্ডই আবার স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু তুর্কিস্তানীদের স্বাধীনতা হয় নামে মাত্র। আর তখনই আধুনিক তুর্কমেনিস্তান, উযবেকিস্তান ইত্যাদি রাষ্ট্রগুলো নামমাত্র স্বাধীনতা লাভ করে।

★উইঘুর পরিচিতি:

তুর্কিস্তানের মুসলিমরা 'উইঘুর' নামে পরিচিত। উইঘুর হচ্ছে তুর্কি বংশোদ্ভূত মুসলিমদের একটি শাখা। পূর্ব ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এদের বসবাস। উইঘুর মুসলিমদের মোট সংখ্যা প্রায় এক কোটি ১৩ লাখ ৭০ হাজার। এর মধ্যে চীনের জিনজিয়াং প্রদেশেই বাস করে ৮৫ লাখের মতো। হুনানসহ অন্যান্য চীনা প্রদেশ ও রাজধানী বেইজিংসহ বিভিন্ন নগরীতেও অল্পসংখ্যক উইঘুর বাস করে। এ ছাড়া কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, উজবেকিস্তান, তুরস্ক, রাশিয়া, তাজিকিস্তান, পাকিস্তান ও মঙ্গোলিয়াতে উইঘুরদের বসবাস রয়েছে। এরা সুন্নি মুসলমান এবং অনেকেই সুফিবাদ চর্চা করেন।

উইঘুর শব্দের অর্থ হচ্ছে নয়টি গোত্রের সমষ্টি বা সমন্বয়। তুর্কি ভাষায় এ জন্য উইঘুর শব্দকে বলা হয় 'টকুজ-ওগুজ'। টকুজ অর্থ নয় এবং গুর অর্থ উপজাতি। ওগুজ থেকে গুর শব্দটি এসেছে। প্রাচীন আমলে আলতাই পর্বতমালার পাদদেশে তুর্কিভাষী বিভিন্ন গোত্র বা উপজাতি বাস করত। এদের মধ্যে নয়টি উপজাতিকে নিয়ে উইঘুর সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। উইঘুরদের কখনো কখনো ‘গাউচি’ এবং পরে ‘তিয়েলে’ জনগোষ্ঠী হিসেবেও ডাকা হতো। তুর্কি শব্দ তিয়েলে বা তেলে এর অর্থ হচ্ছে নয়টি পরিবার। বৈকাল হ্রদের আশপাশের এলাকায় বসবাসকারী সিয়র তারদুস, বাসমিল, ওগুজ, খাজার, আলানস, কিরগিজসহ মোট নয়টি গোষ্ঠীর সমন্বয়ে উইঘুর নামের জনগোষ্ঠী বা জাতি গড়ে ওঠে।

উত্তরাঞ্চলীয় ওয়েই রাজবংশের শাসনামলে উইঘুর জাতির অস্তিত্বের দলিলপত্র পাওয়া গেছে।এক সময় তারিম অববাহিকা থেকে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত উইঘুর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। যুদ্ধবিগ্রহ, বন্যা, খরাসহ নানা কারণে এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে মঙ্গোলিয়ার উইঘুররা তারিম অববাহিকা এলাকায় চলে গিয়ে সেখানে ছোট ছোট কয়েকটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এ সময়ই বর্তমান জিনজিয়াং এলাকাটি কখনো 'উইঘুরিস্তান' আবার কখনো 'পূর্ব তুর্কিস্তান' নামে উইঘুর মুসলিমদের শাসনে ছিলো।

★ইসলামের আগমণ:

হিজরী প্রথম শতকেই তুর্কিস্তান অঞ্চলে মুসলিম বিজয়ীদের মাধ্যমে ইসলামের আগমণ ঘটে। ২য় খলীফা উমার রা. এর যুগে সর্ব প্রথম পশ্চিম তুর্কিস্তানের দক্ষিণ অঞ্চল বিজয় হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে এর সীমানা বাড়তে থাকে। ৯৬ হিজরী সনে 'উমাইয়া' বংশীয় শাসক ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিকের যুগে বিখ্যাত মুসলিম বীর, সেনাপতি কুতাইবাহ বিন মুসলিমের হাতে পূর্ব তুর্কিস্তানের ঐতিহাসিক শহর 'কাশগড়' বিজয় হয়।

বিজয়ের পর কুতাইবাহ্ বিন মুসলিম চীন সম্রাটের দরবারে হুবাইরার নেতৃত্বে ৩০০ জনের এক প্রতিনিধিদল পাঠান। তারা সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাকে "হয়তো ইসলাম গ্রহণ, নতুবা কর প্রদান, অন্যথায় মুকাবালার জন্য প্রস্তুত" থাকতে বললেন এবং কুতাইবাহর পক্ষ থেকে চীন বিজয়ের দৃঢ় সংকল্পের কথা জানিয়ে দিলেন। তাদের দুঃসাহসিকতাপূর্ণ কথা ও কাজে চীন সম্রাট ভীত হয়ে যায় এবং নিজ দেশের কিছু মাটি, প্রচুর পরিমাণ সোনা-রূপা এবং রাজ পরিবার ও অন্যান্য শাহজাদাদের মধ্য হতে ৪০০ জনের একটি দল কুতাইবাহর খিদমাতে প্রেরণ করে। এর বিস্তারিত বিবরণ সুবিখ্যাত ইতিহাস-বই 'আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ'তে উল্লেখ আছে।

★পরবর্তী ইতিহাস:

তারপর থেকে পূর্ব তুর্কিস্তান মুসলিমদের শাসনেই ছিলো। ব্যতিক্রম ঘটে, ১৬৬৪ সালে যখন বর্তমান চীনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মাঞ্চু শাসকরা এক রাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তারা মঙ্গোলিয়ার অধিকাংশ এলাকা, পূর্ব তুর্কিস্তান ও তিব্বত দখল করে এবং ২০০ বছর পর্যন্ত এই এলাকা তারা দখল করে রাখে। এই সময়কালে

মাঞ্চু সম্রাটদের বিরুদ্ধে উইঘুররা অন্তত ৪২ বার বিদ্রোহ করেছে। শেষ পর্যন্ত ১৮৬৪ সালে উইঘুররা পূর্ব তুর্কিস্তান থেকে ওদেরকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন এবং কাশগড়কেন্দ্রিক এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এটাকে 'ইয়েতিসার' বা সাত নগরীর দেশও বলা হতো। কারণ কাশগড়, ইয়ারখন্ড, হোতান, আকসু, কুচা, কোরলা ও তুরফান নামে সাতটি নগরী এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উসমানী সালতানাত ১৮৭৩ সালে, জার শাসিত রাশিয়া ১৮৭২ সালে ও গ্রেট ব্রিটেন ১৮৭৪ সালে উইঘুরদের নতুন এই রাজ্য পূর্ব তুর্কিস্তানকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এমনকি এর রাজধানী কাশগড়ে এই তিনটি দেশ তাদের কূটনৈতিক মিশনও খুলেছিল। কিন্তু রাশিয়ার জার পূর্ব তুর্কিস্তান দখল করে নিতে পারে এমন আশঙ্কায় মাঞ্চু শাসকরা ১৮৭৬ সালে আবার হামলা করে পূর্ব তুর্কিস্তানে।

★জিনজিয়াং নামকরণ:

জেনারেল ঝু জংতাংয়ের নেতৃত্বে ওই বাহিনীর হামলার প্রতি সমর্থন জানায় ব্রিটেন। দখলের পর ১৮৮৪ সালের ১৮ নভেম্বর পূর্ব তুর্কিস্তানের নাম পাল্টে রাখা হয় 'জিনজিয়াং' বা 'সিনকিয়াং' যার অর্থ 'নতুন ভূখণ্ড'। কিন্তু মুসলিম বিশ্ব এখনো এই এলাকাকে মোগলিস্তান বা তুর্কিস্তানের পূর্ব অংশ হিসেবেই জানে। জিনজিয়াং নামকরণের আগে এই ভূখণ্ড মাঞ্চু চীনাদের কাছে 'হুইজিয়াং' বা মুসলিমদের ভূখণ্ড হিসেবে পরিচিত ছিল।

★পূনরায় স্বাধীনতা:

পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার পর উইঘুর স্বাধীনতাকামীরা তাদের মুক্তির লড়াই অব্যাহত রাখে। ১৯৩৩ ও ১৯৪৪ সালে তারা দুইবার বিদ্রোহ করেছে এবং শেষবার তারা সফলও হয়। তারা আবার পূর্ব তুর্কিস্তান প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। চীনের জাতীয়তাবাদী সরকার স্বাধীন তুর্কিস্তানকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং জোসেফ স্টালিনের সোভিয়েত ইউনিয়নও নতুন এই রাষ্ট্রকে সমর্থন জানায়। কিন্তু চীনের গৃহযুদ্ধে জাতীয়তাবাদীরা হেরে যাওয়ার পর 'মাও সে তুংয়ের' নেতৃত্বে বিজয়ী কমিউনিস্টরা তুর্কিস্তানকে চীনের সাথে কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু এতে উইঘুর নেতারা রাজি হননি। এর পর এক রহস্যঘেরা বিমান দুর্ঘটনায় পূর্ব

তুর্কিস্তানের সব শীর্ষ উইঘুর নেতা প্রাণ হারান। প্রচলিত আছে যে, মাও সে তুংয়ের চক্রান্তেই ওই বিমান দুর্ঘটনা ঘটানো হয়েছিল।

★কমিউনিস্ট চীনের দখলে পূর্ব তুর্কিস্তান:

ওই বিমান দুর্ঘটনার পরপরই জেনারেল ওয়াং ঝেনের নেতৃত্বে বিশাল এক চীনা বাহিনী মরুভূমি পাড়ি দিয়ে পূর্ব তুর্কিস্তানে হামলা চালিয়ে সেটি দখল করে। এরপর ওই ভূখণ্ডের নাম পরিবর্তন করে আবার জিনজিয়াং রাখা হয়। চীনা দখলের পর অনেক স্বাধীনতাকামী উইঘুর নেতা পালিয়ে তুরস্কে ও বিভিন্ন পশ্চিমা দেশে চলে যান। তখন থেকেই জিনজিয়াংয়ের উইঘুর মুসলিমদের ওপর চীনা কমিউনিস্ট সরকার নানাভাবে নিপীড়ন চালিয়ে আসছে।

চীন সরকার মুসলিমদের ইতিহাস ও কাশগড় নগরীর প্রাচীন ভবনগুলো ধ্বংস করে দিয়েছে। এমনকি এখান থেকে প্রাদেশিক রাজধানী সরিয়ে হাজার মাইল দূরের 'উরুমচি' বা 'উরুমকি'কে জিনজিয়াংয়ের রাজধানী বানিয়েছে। তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, পরিচিতি ও স্বার্থের প্রতি সরকারের ন্যূনতম শ্রদ্ধাবোধ নেই। উইঘুর শিশুরা স্কুলে তাদের নিজস্ব ভাষা ও ধর্ম শিক্ষা করতে পারে না। স্কুলে কেবল চীনা ভাষাতেই শিক্ষা দেয়া হয়। হান চীনারা তাদেরকে আবর্জনার মতো গণ্য করে। সরকার উইঘুরদের প্রান্তিক অবস্থায় ঠেলে দেয়ার জন্য বিগত বছরগুলোতে উরুমচিসহ জিনজিয়াংয়ের অন্যান্য স্থানে লাখ লাখ হানকে এনে বসতি গড়ে দিয়েছে। রাজধানী উরুমচির প্রায় ২৩ লাখ মানুষের মধ্যে ৭৫ শতাংশের বেশি হচ্ছে হান। এটি এখন হানদের নগরীতে পরিণত হয়েছে।

★হান পরিচিতি:

চীনের অধিকাংশ অধিবাসীকে বলা হয় 'হান'। কিন্তু এই হান ছাড়াও চীনে বাস করে একাধিক জাতি। যে অঞ্চলে হান চীনাদের বাস, তাকে বলা হয় খাস চীন।

চীনা বলতে প্রধানত আমাদের মনে আসে এই হান চীনাদের কথা। চীনের ইতিহাস ও সভ্যতা বলতে সাধারণভাবে আমরা যা বুঝি, তা হলো এই হান চীনাদেরই সৃষ্টি।

চীনের যে অঞ্চল মাঞ্চুরিয়া নামে পরিচিত, সেখানে বাস করত মাঞ্চুরা। নৃজাতিক দিক থেকে এরা হলো হান চীনাদের থেকে ভিন্ন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

মাঞ্চুদের এক রাজা খাস চীন দখল করে সপ্তদশ শতাব্দীতে এবং মাঞ্চু রাজবংশ মহাচীন শাসন করে ১৯১২ সাল পর্যন্ত। মাঞ্চুরা আর হান চীনারা এখন প্রায় এক হয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। মাঞ্চু রাজারা এক পর্যায়ে চীনের সভ্যতাকেই নিজেদের করে নিয়েছে। কিন্তু মাঞ্চু ও হানদের মধ্যে যে রকম সদ্ভাব গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে, মহাচীনে বসবাসকারী অন্যান্য নৃজাতি ও ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সাথে হান চীনাদের একই রকম সদ্ভাব গড়ে উঠতে পারেনি। যেমন তিব্বতী ও তুর্কিস্তানীদের সাথে ওদের বৈষম্যমূলক আচরণ।

★মুসলিমদের উপর কঠোরতা:

জিনজিয়াংয়ে চীন সরকারের অনুসৃত কঠোর নীতির কারণে খুব সামান্যসংখ্যক উইঘুর মুসলিমই হজ্জে যাওয়ার সুযোগ পান। রমজান মাসে উইঘুর সরকারি কর্মচারীরা রূযা রাখতে পারেন না কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞার কারণে। জুমার নামাজের খুৎবায় কী কথা বলা হবে সেটাও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আগেই ইমামকে বলে দেয়। উইঘুরদের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত কাশগড় নগরীর অনেক মসজিদ ও ভবন ভেঙে ফেলে সেখানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। নগরীর অনেক এলাকার মুসলিমদের উচ্ছেদ করে কাশগড় থেকে শত মাইল দূরে নির্মিত আবাসিক কমপ্লেক্সে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে তাদের কোনো অনুমতি নেয়া কিংবা জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজন মনে করেনি সরকার।

★পূর্ব তুর্কিস্তান সম্পর্কিত কিছু বাস্তব তথ্য:

:: ::::::::::::

(১) ঐতিহাসিকভাবে পূর্ব তুর্কিস্তান কখনোই চীনের অংশ ছিল না। বরং এই ভূমিকে 'হান' চীনারা উপনিবেশে পরিণত করেছে, যেমন ভাবে ব্রিটিশরা আমাদের উপমহাদেশকে উপনিবেশে পরিণত করেছিল। এই ভূমির অবস্থান চীনের মহা প্রাচীরের বাইরে। আমরা জানি, চীনের মহা প্রাচীর ছিল চীনের সীমানা নির্ধারক স্থাপনা যা বহিঃশত্রুদের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকতে চীনারা নির্মাণ করেছিল। পূর্ব তুর্কিস্তান যেমনি চীনের প্রাচীরের বাইরে, ঠিক তেমনি Jade Gate (জেড ফটক) এর পশ্চিমে। সুতরাং ইতিহাস সাক্ষী, কস্মিনকালেও পূর্ব তুর্কিস্তান চীনের অংশ ছিল না। তাই, শুধুমাত্র পূর্ব তুর্কিস্তান নাম পরিবর্তন করে জিনজিয়াং/ সিংকিয়াং (অর্থ- নতুন রাজ্য) রাখলেই অতীত ইতিহাস বদলে যাবে না।

(২) বিগত দুই সহস্রাব্দের মধ্যে ১৮০০ বছরই পূর্ব তুর্কিস্তান চীনের কবল থেকে মুক্ত ছিল। আর ১০০০ বছর পুরনো ইসলামী ইতিহাসের কথা হিসাব করলে, দীর্ঘ ৭৬৩ বছর পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলিমরা স্বাধীন থাকলেও, বর্তমানে ও অতীতের বিভিন্ন সময় মিলিয়ে মোট ২৩৭ বছর তারা চীনের কাছে পরাধীন আছে।

(৩) ১৯৪৯ সালের হিসাব অনুযায়ী পূর্ব তুর্কিস্তানের ৯৩% জনসংখ্যা ছিল উইঘুর বা তুর্কি মুসলিম। কিন্তু এ সংখ্যা কমে ৯৩ % থেকে বর্তমানে ৫৫% এ নেমে এসেছে। কারণ, বিগত ৬০ বছর যাবত চীনা কমিউনিস্ট সরকার মুসলিমদেরকে পূর্ব তুর্কিস্তান থেকে চীনের অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে বাধ্য করেছে। বর্তমানে এখানে হান চীনাদের সংখ্যা ৪৫%, যেখানে কমিউনিস্টদের ক্ষমতা দখলের আগে অর্থাৎ ১৯৪৯ সালে যা ছিল মাত্র ৭%।

(৪) ১৯৪৯ সালে চীনের ক্ষমতা দখলের পর থেকে কমিউনিস্ট সরকার বেশ কয়েকবার পূর্ব তুর্কিস্তানে চৈনিক জাতিশুদ্ধি অভিযান চালায়। যাতে প্রাণ হারায় প্রায় ৪৫ লক্ষ মুসলিম।

(৫) চীনা সরকার এ পর্যন্ত নিজেদের নাগালে যতগুলো কুরআনের কপি কিংবা দ্বীনী কিতাব পেয়েছে, প্রত্যেকটাকে বাজেয়াপ্ত করেছে। ওরা এ পর্যন্ত মোট ত্রিশ হাজার সাতশ টি (৩০,৭০০) মুদ্রিত আধুনিক ও হাতে লেখা প্রাচীন ইসলামী কিতাব আগুনে ভস্ম করেছে, আটাশ হাজার (২৮,০০০) মসজিদ বন্ধ করে দিয়ে সেগুলোকে বারে (মদের আড্ডা) পরিণত করেছে, আঠারো হাজার (১৮,০০০) মাদ্রাসা গুদামঘরে পরিণত করেছে, এক লক্ষ বিশ হাজার (১,২০,০০০) আলেমে দ্বীনকে হত্যা করেছে এবং চুয়ান্ন হাজার (৫৪,০০০) জনকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে লেবার ক্যাম্পের শ্রমিক-মজুর বানিয়েছে।

(৬) চীনে কোন মুসলিমকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার শাস্তি: ১০ বছরের কারাদণ্ড!

(৭) মুসলিম মহিলাদের হিজাব পরিধান আইনত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ! কোন মুসলিমা বোন হিজাব পড়ে যদি ধরা পড়েন, তাকে ৫০০০ ডলার জরিমানা দিতে হয়। অথচ পূর্ব তুর্কিস্তানের একজন মুসলিমের সারা বছরের গড় আয়ই কিনা কেবলমাত্র ১০০০ ডলার!

(৮) চীন পূর্ব তুর্কিস্তানকে পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা করার জায়গা বানিয়েছে। এ পর্যন্ত তারা সেখানে মোট ৩৫ টি পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা করেছে, যার তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে দুই লক্ষ (২,০০,০০০) মুসলিম প্রাণ হারিয়েছে। অনবরত পারমাণবিক বোমা পরীক্ষার কারণে পূর্ব তুর্কিস্তানে তেজস্ক্রিয়তার এমন প্রভাব পড়েছে যে এক বছরেই (১৯৯৮ সাল) সেখানে বিশ হাজারের (২০,০০০) উপর বিকলাঙ্গ ও প্রতিবন্ধী শিশু জন্মগ্রহণ করেছে। আর বিগত বছরগুলোতে পূর্ব তুর্কিস্তানে ক্যান্সার, প্যারালাইসিস এবং বেশ কিছু জীবন নাশক অজানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছে।

(৯) বিশ এর কম বয়সী তরুণদের কুরআন শেখা, মসজিদে আসা, এমনকি জুমার নামায পড়াও নিষিদ্ধ!!! আর যাদের বয়স ২০ এর উপর তাদেরকে যদিও জুমা পড়ার সুযোগ দেয়া হয়, কিন্তু তাদেরকে নামায পড়ার জন্য মাত্র ২০ মিনিট সময় দেয়া হয়। ২০ মিনিটের চেয়ে ১ সেকেন্ড বেশী সময় মসজিদে থাকা আইনত নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয়!!!

(১০) পূর্ব তুর্কিস্তানকে সদা 'শান্ত' রাখতে চীনা সরকার সেখানে সেনা ও পুলিশবাহিনীর ১০ লক্ষ সদস্যকে সর্বদা মোতায়েন করে রাখে।

সূত্র: উইকিপিডিয়া, বিভিন্ন ওয়েব সাইট ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ সমূহ।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৬৯৫৯

নবিপ্রেমে সহাস্যবদনে জীবনোৎসর্গকারী তরুণ

গাজি ইলমুদ্দিন শহিদ রহ. : সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

মাওলানা আলী হাসান উসামা

HIND_AQSA

Senior Member

০৬-১৯-২০১৭

আমি যুগকে মন্দ বলি না। যুগকে কোনো দোষারোপ করি না। যুগের কী দোষ! যুগ তো কোনো অপরাধ করেনি। অপরাধ করেছে তার লোকেরা; যারা পূর্বসুরিদের বাহ্যিক অবয়ব তো ঠিকই ধরে রেখেছে, কিন্তু তাদের ভেতরজগত ও মনমানসিকতা একেবারে পঁচে গেছে। যে কাজ করে গাজি ইলমুদ্দিন সে যুগে হয়েছিলো সর্বমহলে নন্দিত, সেই একই কাজ করে উম্মাহ আজ হচ্ছে চরমভাবে নিন্দিত। যুগের জ্ঞানীরাই তাদের সমালোচনায় সরব। তাদেরকে কোণঠাসা করার জন্য যেনো তারা বদ্ধপরিকর। এক্ষেত্রে কোনোভাবে সাফল্য পেলে রীতিমতো হাসির হররা ছোটে তাদের দুর্গন্ধময় মুখে। সেই ভয়ানক গগনবিদারী হাসির ধ্বনিতে শয়তানের রাজসিংহাসনও বুঝি থরথর করে কেঁপে ওঠে। গাজি ইলমুদ্দিনের জীবনীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে আর তাকে যুগের সাথে মিলালে অনেক তিক্ত বাস্তবতা সূর্যের মতো প্রোজ্জ্বল হয়ে চোখের সামনে ধরা দেয়। এই অমর শহিদের স্মরণে তাই আমাদের এ সামান্য প্রয়াস...

এক.

পুরো হিন্দুস্তান উত্তাল। স্বামী পণ্ডিত চিমোপতি লাল রচিত রাসুলুল্লাহর সা. এর পবিত্র বৈবাহিক জীবন নিয়ে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যে ভরপুর কুখ্যাত বই 'রঙ্গিলা রাসুল' প্রকাশের অপরাধে প্রকাশক রাজপালের বিরুদ্ধে চলছে তুখোড় আন্দোলন। ইংরেজ সরকার নীরব। মুসলমানদের ধর্মীয় মূল্যোবোধকে বিনষ্ট করার মানসে হিন্দুদেরকে ধর্মীয় উস্কানিমূলক সকল কাজের বৈধতা দিয়ে রেখেছে ইংরেজ সরকার। মুসলমানরা দগ্ধ হৃদয় নিয়ে প্রকাশক রাজপালের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়ার লক্ষ্যে বারবার সরকারের কাছে আবেদন করেছে। কিন্তু প্রতিবারই তাদেরকে ব্যর্থ মনোরথে ফিরতে হয়েছে। উল্টো ইংরেজ সরকার প্রকাশক

রাজপালের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ নিয়োগ করেছে। মুসলমানরা যেনো আন্দোলন করে রাজপথ উত্তপ্ত করতে না পারে এজন্য ফিরিঙ্গিরা পূর্বেই ১৪৪ ধারা জারি করে রেখেছে। আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী আলিমদেরকে ধরে ধরে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে আন্দোলনকে নির্বাপিত করতে চেয়েছে। কিন্তু এতে মুসলমানদের ভেতরের জ্বলন আগ্নেয়গিরির তপ্ত লাভার মতো শুধু বেড়েছেই। ভেতরের আগুন ধীরে ধীরে বাইরেও ছড়িয়েছে।

১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করে অগণিত মুসলমান সেদিন দিল্লি দরজার অভ্যন্তরে শাহ মুহাম্মাদ গওস রহ. চত্বরে সমবেত হয়। সমাবেশে নেতৃত্ব দান করেন আশিকে রাসুল আমিরে শরিয়ত সাইয়িদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারি রহ.। শাহজি রহ. সেদিন নবিপ্রেমে ব্যাকুল হয়ে এমন ইমানদীপ্ত অগ্নিঝরা বক্তৃতা করেন, যা শ্রোতাদের হৃদয়ে দাউ দাউ করে ইমানের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে। সেই সমাবেশে মুফতি কিফায়াতুল্লাহ রহ. এবং মাওলানা আহমদ সাইদ দেহলবি রহ.ও উপস্থিত ছিলেন। শাহজি রহ. সেদিন তার ভাষণে বলেন—

“আজ আপনারা জনাবে ফখরে রাসুল মুহাম্মাদে আরাবি সা. এর ইজ্জত এবং মর্যাদা সংরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে এখানে সমবেত হয়েছেন। আজ সমগ্র মানবজাতিকে ইজ্জত দানকারী মানুষটির ইজ্জত ঝুঁকির মধ্যে। আজ সেই মহান মানবের ইজ্জত ঝুঁকির মুখে পড়ে আছে, যার দেয়া ইজ্জত নিয়ে সমগ্র সৃষ্টিকুল গর্ব করে। আজ মুফতি কিফায়াতুল্লাহ এবং মাওলানা আহমদ সাইদের দরজায় উম্মুল মুমিনিন আয়িশা সিদ্দিকা, উম্মুল মুমিনিন খাদিজাতুল কুবরা রা. দাঁড়িয়ে সকরুণ কণ্ঠে আওয়াজ দিচ্ছেন, “আমরা তোমাদের মা। তোমরা কি জানো না যে, কুফফার গোষ্ঠী আমাদেরকে গালি দিচ্ছে।” আরে দেখো, কোথাও উম্মুল মুমিনিন আয়িশা সিদ্দিকা রা. দরজায় দণ্ডায়মান নয়তো?!”

শাহজি রহ. কথাটি হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে এমনভাবে উচ্চারণ করেন যে, সাথে সাথে সমবেত জনতা সকলে প্রায় দরজার দিকে ঘুরে তাকায়। পুরো মজলিসজুড়ে কান্না ও আর্তনাদের আওয়াজ ভেসে ওঠে। এরপর শাহজি রহ. বলেন— “তোমাদের মহব্বতের তো এই দশা যে, তোমরা সাধারণ সাধারণ অবস্থায় জীবন উৎসর্গ করে বসো অথচ তোমাদের কি জানা নেই যে, আজ রাসুলুল্লাহ সা. সবুজ গম্বুজের নিচে তড়পাচ্ছেন। আজ খাদিজা এবং আয়িশা রা. পেরেশান। বলো,

তোমাদের হৃদয়ে উম্মুল মুমিনিনদের জন্য কোনো জায়গা আছে কি? আজ উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা. তোমাদের কাছে হক তলব করে ফিরছেন; সেই আয়িশা, রাসুলুল্লাহ সা. যাকে ভালোবেসে 'হুমায়রা' বলে ডাকতেন, সেই আয়িশা, যিনি সাইয়িদে আলম সা. এর তিরোধানের সময় তাকে মিসওয়াক চিবিয়ে দিয়েছেন। স্মরণ রেখো, যদি তোমরা খাদিজা এবং আয়িশা রা. এর জন্য নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিতে পারো, তাহলে তা কম গর্বের কথা নয়।

যতোক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান জীবিত আছে, রাসুলের ইজ্জতের ওপর হামলাকারীরা কিছুতেই প্রশান্তির সাথে বাঁচতে পারে না। পুলিশ মিথ্যা, সরকার আলসে আর ডিপুটি কমিশনার অযোগ্য। ওরা হিন্দু সংবাদধারার বাচালতা ও বকবক তো বন্ধ করতে পারে না, কিন্তু উলামায়ে কেরামের ভাষণ-বক্তৃতা বন্ধ করে দিতে চায়। সময় এসেছে, আজ এখানে ১৪৪ ধারা টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দেয়া হবে। আমি ১৪৪ ধারাকে আমার জোতার নিচে পিষ্ট করে বলবো—

پڑا فلک کو دل جلوں سے کام نہیں
جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں

এক সপ্তাহের মধ্যে যদি আমার নানার এই মালউন

গোস্তাখকে কোনো মুসলমান নওজোয়ান হালাক করতে না পারে, তাহলে রাসুলুল্লাহর হুরমতের কসম, এই সাইয়িদজাদা বুড়ো নিজ হাতে এই মহান ফরজ কর্ম সম্পন্ন করবে।"

সেদিনই আঞ্জুমানে খুদ্দামুদদীন শহরের ফটকে ফটকে রাজপালকে হত্যা করা ওয়াজিব মর্মে ফতোয়া টানিয়ে দেয়। আলিমউলামা জনসাধারণ সকলের যবানেই 'শাতিমে রাসুল'কে জাহান্নামের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর অপরিহার্যতার কথা চর্চা হতে থাকে।

তিন.

১০ এপ্রিল ১৮৭৫ তারিখে সনাতন হিন্দুধর্ম থেকে নতুন শাখা উৎসারিত হয়, যার নাম আরিয়া সমাজ। এর প্রবর্তক স্বামী দিয়ানন্দ সরস্বতী ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে

গুজরাটে জন্মগ্রহণ করে। স্বামী দিয়ানন্দ সরস্বতী হিন্দুধর্মকে নতুন করে সংস্কার-সংশোধন করে, তার জন্য নয়া সীমারখা নির্ধারণ করে। সে মূর্তিপূজাকে অস্বীকার করে। দেবদেবীকে উপাস্য হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে। জাতপাতকে ধর্মীয় বা প্রকৃতিগত বিভাজন স্বীকার না করে রাজনৈতিক বিভাজন বলে আখ্যায়িত করে। স্বল্প সময়েই তার এই সংস্কার ধারা শিক্ষিত প্রজন্মকে আকর্ষণ করে। দলে দলে তারা আরিয়া সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। আরিয়া সমাজের জন্য আলাদাভাবে আইন প্রণয়ন করা হয়। এই মতবাদকে সমগ্র হিন্দুস্তানে প্রসার করার জন্য শৃঙ্খলিত পদক্ষেপ নেয়া হয়। আরিয়া সমাজের জন্য নির্ধারিত কোঠা ঘোষণা করা হয়। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে স্বামী দিয়ানন্দ সরস্বতী দুনিয়া ত্যাগ করে। স্বামী দিয়ানন্দ সরস্বতী শুধু হিন্দুধর্ম সংস্কারের কাজই করেনি, বরং ইসলামের ওপর জ্ঞানগতভাবে আক্রমণ করে। নিজের অপরিপক্ক মাথাকে ব্যবহার করে ইসলাম কোরআন নবি— সবকিছুকেই তার তীর্যক আপত্তির লক্ষ্যস্থল বানায়। ইসলামের ওপর তার প্রসিদ্ধ এগারোটি আপত্তি ছিলো। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতবি রহ. তার আপত্তিগুলোকে 'ইনতিসারে ইসলাম', 'কিবলাহ নুমা' এবং 'তুরকি ব তুরকি' গ্রন্থত্রয়ে খণ্ডন করেন। নরাধম দিয়ানন্দ সরস্বতীর মৃত্যুর সুদীর্ঘকাল পর তার রচিত কোরআনের বিরুদ্ধে শত আপত্তিবিদ্রূপে ভরপুর বই 'সত্তিয়ারথ পোরকাশ' উর্দুতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। বইটিকে উর্দু ভাষায় অনুবাদ করে 'রঙ্গিলা রাসুলে'র লেখক স্বামী পণ্ডিত চিমোপতি এম এ। রাজপাল নামক এক কট্টর হিন্দু প্রকাশক লাহোরে অবস্থিত তার লাইব্রেরি থেকে এ বই প্রকাশ করে মুসলমানদের হৃদয়কে চরমভাবে আহত করে। মুসলমানরা বইটির প্রকাশনার ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নেয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা-পরিশ্রম করে। কিন্তু এই বিশাল জনগোষ্ঠীর চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে বিন্দুমাত্র মূল্যায়ন না করে, তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধের ওপর চরমভাবে আঘাত করে ফিরিঙ্গিরা সাদা চামড়ার ভেতরে সুপ্ত নিজেদের চরম কুশ্রী মুখোচ্ছবি প্রকাশ করে। রাজপালের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে তার প্রকাশনীর কর্মচারী মুনশি রাম সরকারি সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করে। এই মুনশি রাম কিছুদিনের মধ্যেই রাতারাতি 'শ্রীমান মহাত্মা সোরাগ বাশী সোয়ামী শ্রীদ্ধানন্দজি' বনে যায়। এরপর সে অবিরল কোরআন ইসলাম এবং নবিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে লিটারেচার প্রকাশ করতে থাকে। তবে তার এই কুকর্মের ধারা খুব বেশি দীর্ঘায়িত হতে পারে না। এক

জানবাজ মুজাহিদ কাজি আব্দুর রশিদ শহিদ রহ. এর হাতে তার জীবননাটিকার যবনিকাপাত হয়। তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই নরাধম রাজপাল 'রঙ্গিলা রাসুল' প্রকাশ করে।

তিন.

আমিরে শরিয়ত আতাউল্লাহ শাহ বুখারি রহ. এর ইমানদীপ্ত অগ্নিঝরা ভাষণে প্রভাবিত হয়ে লাহোরে অবস্থানকারী অত্যন্ত সুশ্রী ও নুরানি চেহারার অধিকারী এক কাশ্মীরি যুবক গাজি খোদাবখশ ইবনে মুহাম্মাদ আকরাম ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ তারিখে জানবাজি রেখে নরাধম রাজপালের ওপর আক্রমণ চালান। কুখ্যাত রাজপাল নিজ লাইব্রেরিতে কাজে ব্যস্ত ছিলো। এমন সময় গাজি খোদাবখশ রহ. এসে ধারালো ছুরি নিয়ে রাজপালের ওপর অতর্কিত হামলা চালান। আকস্মিক এ আঘাতে রাজপাল আহত হয়। তার শরীর থেকে রক্তের ধারা বইতে থাকে। কিন্তু দ্রুতবেগে নিজেকে সামলে নিয়ে রাজপাল সেখান থেকে পলায়ন করে। পুলিশ গাজি খোদাবখশ রহ. কে ৩০৭ ধারার অধীনে গ্রেফতার করে। লাহোর ডিস্ট্রিক্ট মেজিস্ট্রেট কোর্টে মামলার রায়ের শুনানি হয়। গাজি খোদাবখশ রহ. নিজের পক্ষে কোনো ওকিল গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। রাজপাল আদালতে সকরুণ কণ্ঠে আরজ করে, "আমার ওপর এ হামলা মুক্তচিন্তার বই প্রকাশ এবং মুসলমানদের এজিটেশনের কারণে করা হয়েছে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, অপরাধী খোদাবখশ আমাকে জানে মেরে ফেলবে।"

জজ জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি আরো কিছু বলবেন?"
রাজপল বললো, "হামলার সময় অপরাধী চিৎকার করে বলছিলো, কাফিরের বাচ্চা, আজ তুই আমার হাতে এসেছিস। আজ আর তোকে জীবিত ছাড়বো না।"
জজ গাজি খোদাবখশ রহ. এর কাছে এর ব্যাখ্যা তলব করলে তিনি গর্জে উঠে বলেন, "আমি মুসলমান। রাসুলের ইজ্জত রক্ষা করা আমার ওপর ফরজ। আমি কিছুতেই আমার 'আকা' এবং 'মাওলা' মুহাম্মাদ সা. এর অপমান বরদাশত করতে পারি না।" এরপর মালউন রাজপালের দিকে ইশারা করে বলেন, "সে আমার প্রিয় রাসুলের শানে গোস্তাখি করেছে। এজন্য আমি তার ওপর জীবনবাজি রেখে আক্রমণ করেছি। কিন্তু এই নরাধম সেসময়ে আমার হাত থেকে একটুর জন্য বেঁচে গেছে।"
অপরাধের স্বীকারোক্তি প্রদানের পর আদালত গাজি খোদাবখশ রহ. এর ব্যাপারে

সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ঘোষণা করে, যার মধ্যে তিনমাস একাকী বাসের শাস্তিও রয়েছে। এবং নির্ধারিত মেয়াদ খতম হওয়ার পরে নিরাপত্তা লাভের জন্য পাঁচ পাঁচ হাজার রুপি মূল্যের তিনটি জামানত দাখিল করার ফায়সালা ঘোষণা করা হয়।

এর কিছুদিন পর ১৯ অক্টোবর ১৯২৭ তারিখে মালউন রাজপালকে জাহান্নামে পৌঁছানোর মানসে আফগানিস্তানের কোহাট থেকে গাজি আব্দুল আজিজ নামের এক ইমানদীপ্ত ব্যবসায়ী যুবক লাহোরে আগমন করে। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে করে মালউন প্রকাশকের লাইব্রেরিতে পৌঁছে। ঘটনাক্রমে সেসময়ে রাজপাল দোকানে ছিলো না। তার পরিবর্তে দোকানে বসা ছিলো তার দুই বন্ধু জিতান্দর দাস এবং স্বামী সত্যানন্দ। দোকানে বসে তারা মুক্তমনে ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছিলো। আলোচনায় অগ্রণী ভূমিকা রাখছিলো স্বামী সত্যানন্দ। গাজি আব্দুল আজিজ কিছু সময় আড়াল থেকে আলোচনা শুনেন। তিনি স্বামী সত্যানন্দকেই রাজপাল ভেবে বসেন। অনন্তর কোষ থেকে তরবারি বের করে এক আঘাতেই স্বামী সত্যানন্দকে জাহান্নামের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন। এরপর তিনি নিজেই সেখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে থাকেন, আমি রাসুলের ইজ্জত হরণকারী নরাধমের ভবলীলা সাঙ্গ করেছি। আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হোক। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে গাজি আব্দুল আজিজ রহ. এ কথাগুলো বলেন—"আমার নাম আব্দুল আজিজ। আমি (সুলতান মাহমুদ গজনবির স্মৃতি বিজড়িত) গজনিতে থাকি। আমার মাতৃভূমির গর্ব, সে সুলতান মাহমুদ গজনবির মতো মহান মুজাহিদ মুবাল্লিগ ও মূর্তিবিনাশকারী মনীষীকে গর্ভে ধারণ করেছে, যেই মাহমুদ গজনবি এই ভারতবর্ষের ওপর কমবেশি সতেরোবার হামলা চালিয়ে কুফুর এবং ইলহাদকে বিনাশ করেছেন এবং মূর্তির নগরকে ইসলামের দৌলত দিয়ে গৌরবান্বিত করেছেন। এই সেই মহান মূর্তিবিনাশকারী, যার সামনে সোমনাতের পূজারীরা সম্পদের পাহাড় ঢেলে দিয়ে এই ফরিয়াদ জানিয়েছে যে, মহারাজ, আপনি এই সমস্ত সম্পদ নিয়ে নিন, তবুও আমাদের মূর্তিদের ওপর যেনো কোনো আঘাত না আসে। কিন্তু ইসলামের এই মহান মুজাহিদ নিঃসঙ্কোচে দৃপ্তকণ্ঠে বলেছেন, মুসলমান মূর্তিবিনাশকারী, মূর্তিবিক্রেতা নয়। এই কথা বলে তিনি সোমনাতের মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন। আল্লামা ইকবাল যার নির্মুখাপেক্ষিতা এবং পূর্ণ ইমানের ওপর গর্ব করে বলেন—

قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی
بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی

তিনি ছিলেন সেই গাজি, যিনি শুনলেন, মুলতানে কারামিতা নামক এক গোষ্ঠী আছে, যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু আদতে তারা কাফির এবং মূর্তিপূজারী। তাদের লৌকিকতার চূড়ান্ত হাল এই ছিলো যে, তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে জামাতের সাথে নামাজ পড়তো, কিন্তু সামনে নাউযুবিল্লাহ হযরত রাসুলে কারিম সা. এর কাল্পনিক অবয়ব বানিয়ে রাখতো। মাহমুদ গজনবির কাছে এই ভয়াল রিপোর্ট পৌঁছামাত্রই তিনি ঘূর্ণিবায়ুর মতো দ্রুতবেগে সেখানে হাজির হন এবং মুলতানের হাকিম দাউদ কারামেতির ভবলীলা সাঙ্গ করে সেখানে ইসলামের পতাকা উড্ডিন করেন। আমাকে স্বপ্নে সুলতান মাহমুদ গজনবি আদেশ করেছেন, যাও, সেই মালউনকে জাহান্নামের দোরগোড়ায় পৌঁছিয়ে উভয় জাহানের কামিয়াবি অর্জন করো। আমার আফসোস হচ্ছে যে, মূল শয়তানকে জাহান্নামে পৌঁছাতে পারলাম না।"

গাজি আব্দুল আজিজের এই সারগর্ভ এবং আলিমসুলভ কথামালা শুনে মুসলিম জনতা সমস্বরে তাকবির দিয়ে আকাশ-বাতাস ভারি করে তুলে। ফিরিঙ্গি হুকুমতের ডিস্ট্রিক্ট মেজিস্ট্রেট এম বি উগলবি আইনি তাকাজা এবং আরো কিছু বিষয়ের প্রতি লক্ষ করে গাজি আব্দুল আজিজ খানকে শাহাদাতের মর্যাদা দেয়ার পরিবর্তে তার ব্যাপারে চৌদ্দ বছরের কারাদণ্ড ঘোষণা করে।

পরাপর দুইবার অতর্কিত আক্রমণে ভীত হয়ে রাজপাল নিজেকে বিপদগ্রস্ত মনে করে। তাই সে আদালতের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। ডিস্ট্রিক্ট মেজিস্ট্রেট রাজপালের নিরাপত্তার জন্য দুই হিন্দু সিপাহী এবং এক শিখ হাবিলদার নিয়োগ করে।

রাজপাল পাহারাবেষ্টিত জীবনকে নিরাপদ জীবন ভেবে বসে। সেসময়ে সে লাহোর ছেড়ে কয়েক মাস অন্যান্য শহরনগর ঘুরে আমোদফূর্তি করে আসে। তার ধারণা ছিলো, এই নাতিদীর্ঘ সময়ে ঝামেলা ও বিপদ কেটে যাবে, মুসলমানদের জযবাও নিস্তেজ হয়ে যাবে। লাহোরে ফিরে সে পুনরায় তার কারবার শুরু করে।

চার.

গাজি ইলমুদ্দিন শহিদ লাহোরের এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে ৪ ডিসেম্বর ১৯০৮ তারিখে জন্মগ্রহণ করে। তার বাবার নাম তালেমন্দ। পেশায় কাঠমিস্ত্রি। লাহোরে এবং তার আশপাশে সততা এবং দক্ষতার কারনে তাদের ভালো সুনাম ছিলো। সম্মানের সাথেই দিনাতিপাত করছিলেন। খুব বড় হওয়ার এবং অনেক সম্পদধারী হওয়ার স্বপ্ন ছিলো না। আর দশটি পরিবারের মতো স্বাভাবিকভাবেই জীবনের ধাপগুলো অতিক্রম করার আকাঙ্ক্ষা ছিলো। সেসময়ে শিশুরা মসজিদ থেকেই প্রাথমিক জ্ঞানার্জন করতো। তালেমন্দ তার ছেলেকেও কোরআন শেখার জন্য মসজিদে পাঠিয়েছিলেন। গাজি ইলমুদ্দিন কিছুদিন সেখানে যাতায়াত করে। কিন্তু অধিক বিদ্যাবুদ্ধি অর্জন করা আর তার নসিবে জোটে না। কুদরত তাকে হয়তো গতানুগতিকতার বাইরে অন্য কোনো মিশনের জন্য প্রস্তুত করছিলো। ইলমুদ্দিনের ভাই মুহাম্মাদুদ্দিন লেখাপড়া করে সরকারি চাকরি লাভ করে। অপরদিকে ইলমুদ্দিন বাবার হাত ধরে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পেশায় আত্মনিয়োগ করে। বাবার মতো সেও একজন ভালো কাঠমিস্ত্রি হয়। ইলমুদ্দিন বাবার সাথে কাজের প্রয়োজনে লাহোরের বাইরেও বিভিন্ন সময়ে গমন করতো।

ইলমুদ্দিন এবং মুহাম্মাদুদ্দিনের মধ্যে বেশ সখ্যতা ছিলো। ভাই-ভাইয়ের মধ্যে এমন প্রগাঢ় ভালোবাসা খুব কমই নজড়ে পড়ে। একবারের ঘটনা, ইলমুদ্দিন তখন বাবার সাথে শিয়ালকোটে গিয়েছে। এদিকে মুহাম্মাদুদ্দিন ভাইয়ের ব্যাপারে দুঃস্বপ্ন দেখে। দুঃস্বপ্ন দেখে অস্থির হয়ে মুহাম্মাদুদ্দিনও শিয়ালকোটে গিয়ে পৌঁছে। মুহাম্মাদুদ্দিন যখন বাবার ঠিকানায় পৌঁছে, তখন ইলমুদ্দিন খাটে বসা ছিলো। ভাইকে দেখে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে। এভাবে দীর্ঘ সময় পার হয়ে যায়। তালেমন্দ মুহাম্মাদুদ্দিনকে বসতে বলেন। মুহাম্মাদুদ্দিন স্বপ্নে ভাইকে যখম হতে দেখেছিলো। এবার সে লক্ষ করে দেখে, বাস্তবেই ইলমুদ্দিন যখম। হাতে পট্টি বাঁধা। কাজে তখন তো মাত্র হাতেখড়ি হচ্ছে। তাই অসতর্কতায় আঘাত পেয়ে হাত যখম হয়েছে। সেখানে একদিন অবস্থান করে বাবার নির্দেশে পরবর্তী দিন মুহাম্মাদুদ্দিন লাহোরে ফিরে আসে।

ইলমুদ্দিন লেখাপড়া শিখেনি ঠিক, তবে পারিবারিকভাবেই মনুষ্যত্বের দীক্ষা নিয়েছে। সততা সত্যবাদিতা অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার মানসিকতা অনুগ্রহকারীর

জন্য জীবনোৎসর্গ করার চেতনা ইত্যাদি বিষয় বাবা-মা'র দৈনন্দিন আচার-রীতি থেকেই তার ভেতরে শেকড় গেঁড়ে নেয়। ইলমুদ্দিন কখনও চিল্লায় যায়নি ঠিক, কখনও হজ-উমরাও করেনি, কখনও খানকাহয়ও যাতায়াত করেনি, আর না কখনও রাযি-কাশশাফ অধ্যয়ন করেছে, মানতিক-ফালসাফা-আসরারে শরিয়ত শিখেছে, না কখনও শায়খের সাথে সম্পর্ক গড়ে দীর্ঘ আমল করেছে, না কখনও মসজিদে গাশত করেছে। কিছুই সে করেনি। দীনি বিষয়ে বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্যই সে অর্জন করেনি। তার তো সম্বল ছিলো শুধু এক কালিমা। যে কালিমা সে পড়তো। যে কালিমাকে সে ভালোবাসতো। যে কালিমা থেকে সে দুই মহান সত্তাকে অনুভব করতো। আল্লাহ এবং তার রাসুলকে ভালোবাসতো। সে হেকমত-মাসলাহাত বুঝতো না। তার ভেতরে জযবা ছিলো। দীনি জযবা। আল্লাহ এবং তার রাসুলকে ভালোবাসার জযবা। এজন্যই তো তার স্মরণে আল্লামা ইকবাল বলেন—

اسی گلاں ای کر دے رہ گئے تے تر خاناں دامنڈابازی لے گیا

অপর এক কবিতায় আল্লামা ইকবাল বলেন—

عشق کی اک ہست نے طے کر دیا قصہ تمام
اس زمین و آسماں کو بے کرا سمجھا تھا میں نے

ইলমুদ্দিন এক সাদাসিধে মুসলমান। সে দিনরাত তার পেশায়ই ডুবে থাকতো। জগতের কোনো খোঁজখবরই তার ছিলো না। রাজপালের ঘৃণ্য উদ্যোগে সারা হিন্দুস্তান যে উত্তাল— এর বিন্দুমাত্র খোঁজও ইলমুদ্দিনের ছিলো না। একদিন সন্ধ্যেবেলায় কাজ শেষ করে ইলমুদ্দিন ঘরে ফিরছিলো। দিল্লি দরজার কাছে আসলে সেখানে এক বিশাল সমাবেশ দেখতে পায়। ডায়াস থেকে এক নওজোয়ানের অগ্নিঝরা বক্তৃতার আওয়াজ তার কানে ভেসে আসে। সে কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়ায়। কিন্তু তার মাতৃভাষা পাঞ্জাবি হওয়ায় উর্দু ভাষণ সে খুব বেশি বুঝতে পারে না। উর্দু ছিলো প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা। তার তো আর প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত

করার সুযোগ হয়নি। পাশের এক ব্যক্তিকে অবস্থা জিজ্ঞেস করলে সে তাকে জানায়, রাজপাল নামের এক হিন্দু প্রকাশক রাসুলুল্লাহ সা. এর শানে গোস্তাখিমূলক বই প্রকাশ করেছে। তার প্রতিবাদে আজকের এ সমাবেশ। কথাটা ইলমুদ্দিনের ভেতরে স্পন্দন জাগায়। রাজপালের দুঃসাহসিকতা তার হৃদয়কে চরমভাবে আহত করে। ইলমুদ্দিন দীর্ঘক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে আলোচনা শুনতে থাকে। কিছুক্ষণ পর স্টেজে আসেন একজন পাঞ্জাবি বক্তা। ইলমুদ্দিন খুব মনোযোগের সাথে তার আলোচনা শোনে। সেখান থেকেই সে জানতে পারে, রাজপাল তার এই দুঃসাহসিক কাজের কারণে 'ওয়াজিবুল কতল' তথা তাকে হত্যা করা অপরিহার্য। ইলমুদ্দিনের মানসজগতে বৈপ্লবিক ঝড় ওঠে। তার চিন্তাভাবনা মনমানসিকতা মুহূর্তেই সব বদলে যায়। কালিমায় এতোদিন একশ্বাসে যে দুই মহান সত্তার নাম নিতো, অশিক্ষিত মানুষটি যে দুই সত্তাকে জানপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো, সেই রাসুলের শানে এই চরম গোস্তাখিকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

সমাবেশ শেষ করে মধ্যরাতে ইলমুদ্দিন ঘরে ফিরে। বাবা জিজ্ঞেস করেন, কী ব্যাপার? আজ হঠাৎ দেরি কেনো? ইলমুদ্দিন সব খুলে বলে। রাজপাল ওয়াজিবুল কতল হওয়ার যে কথা সে শুনে এসেছে তাও বলে। তালেমন্দও একেবারে সাদাসিধে কালিমাপাঠকারী মুসলমান ছিলেন। সব শুনে তিনিও আলোচনার সাথে একাত্মতা পোষণ করেন। তিনিও বলেন, এমন বদমাশকে জাহান্নামেই পৌঁছানো উচিত। কথাটা ইলমুদ্দিনের হৃদয়জগতকে ছুঁয়ে যায়। সে যেনো মৌনভাবে ঘর থেকেও অনুমতি পেয়ে যায়।

সে রাতে ইলমুদ্দিনের আর ঘুম হয় না। পরবর্তী দিন সে তার বন্ধু শেদার সাথে সাক্ষাত করে। শেদাকে সব খুলে বলে। সেই দিনগুলোতে পুরো হিন্দুস্তানজুড়ে মুসলমানদের মূল আলোচনার বিষয় এই একটাই ছিলো। চায়ের দোকান থেকে শুরু করে হাট-বাজার— সর্বত্রই চলছিলো রাজপালের দুঃসাহসিকতা ও আস্পর্ধা নিয়ে আলোচনা। ইলমুদ্দিন নিয়মিত শেদার সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও পরামর্শ করতে থাকলো। কাজকর্ম নাওয়াখাওয়া কোনো কিছুতেই তার আর মন ছিলো না। সারাদিন একই চিন্তা, একই ভাবনা। প্রথমে পরিবারের চোখে বিষয়টা ধরা না পড়লেও আখের তাদের মনেও সন্দেহ জাগে। তারা তো তখনও জানেন না, কী মহান স্বপ্ন-ভাবনা খেলে যাচ্ছে ইলমুদ্দিনের বুকে। তারা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে

পারেননি, তাদের ছেলে তাদের জন্য জান্নাতের সওদা করছে, তাদেরকে ইতিহাসের পাতায় অমরত্ব দানের উদ্যোগ নিচ্ছে। তালেমন্দের এক বন্ধু শেদার সঙ্গে ইলমুদ্দিনের মেলামেশার বিষয়টা তাকে অবগত করে। শেদা অনেক ভালো ছেলে ছিলো। কিন্তু তালেমন্দের সেই বন্ধু তাকে জানায়, শেদা একটা আওয়ারা-লম্পট ছেলে। তার সাথে মেলামেশা করাটা ইলমুদ্দিনের ঠিক হচ্ছে না। তাকে এখনই ফেরানো উচিত। নইলে দিনদিন সে খারাপ হয়ে যাবে। তালেমন্দ ছেলেকে অনেক করে বোঝায়। কিন্তু কিছুতেই কোনো কাজ হয় না।

ইলমুদ্দিন আর শেদা অনেক খুঁজেফিরেও জানতে পারে না যে, কে এই নরাধম রাজপাল আর কোথায়ই বা তার দোকান। সে দেখতেই বা কেমন। পরিশেষে শেদার এক বন্ধুর মাধ্যমে তারা জানতে পারে যে, নরাধম রাজপালের লাইব্রেরি হাসপাতাল রোডে।

এদিকে ইলমুদ্দিনের অনিয়মানুবর্তিতার বিষয়টি তালেমন্দকে অনেক ভাবায়। ছেলে ঠিকমতো কাজে যায় না, নাওয়াখাওয়ারও কোনো খবর নেই। তার কাছে এর একমাত্র কারণ মনে হয় শেদার সঙ্গে মেলামেশা। এদিকে শেদার ব্যাপারে তিনি আরো জানতে পারেন যে, শেদার বাবা একজন জুয়ারি; জুয়ার পয়সা চুখাতে আখের নিজের দোকানটাও যিনি হারিয়েছেন। তালেমন্দ রাগি স্বভাবের মানুষ ছিলেন। একদিন রাতে দেরি করে ঘরে ফিরে ইলমুদ্দিন। তার অপেক্ষায় ঘরের ভেতর পায়চারি করছিলেন তালেমন্দ। ইলমুদ্দিন ঘরে ফিরলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, কোথায় ছিলে আজ সারাদিন? ইলমুদ্দিন জবাব দেয়, শেদার সাথে। উত্তর শুনে তালেমন্দ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ছেলেকে গালমন্দ করতে থাকেন। ইলমুদ্দিন মাথা নিচু করে সব শুনে যেতে থাকে। তালেমন্দ রাগের প্রচণ্ডতায় শেষ অবধি বলে বসেন, এই মুহূর্তে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যা। যা, ঐ বদমাশের কাছে চলে যা। তোর মুখ আর আমাকে দেখাবি না।

বড় ভাই মুহাম্মাদুদ্দিন ঘরেই ছিলো। সে এসে বাবাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে। ছোট ভাইকে হাত ধরে তার কামরায় নিয়ে যায়। এরপর দীর্ঘ সময় নিয়ে খুব করে তাকে বোঝায়। খারাপ সঙ্গ থেকে দূরে থাকতে বলে।

শেদার ব্যাপারে সকলের নেগেটিভ ধারণা দেখে ইলমুদ্দিনও খুব ব্যথিত হয়। কিন্তু সে মনের কথা কাউকেই খুলে বলতে পারে না। কীভাবেই বা বলবে! যেখানে

জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন। সে তো মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে নিয়েছে, যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে তা কারোরই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

এভাবেই দিন যাচ্ছিলো। ছেলের অবস্থার পরিবর্তন না দেখে তালেমন্দ সিদ্ধান্ত নেন, বিশ বছর বয়সী ছেলেকে বিয়ে করিয়ে দেবেন। সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করলে সব ঠিক হয়ে যাবে, অপ্রত্যাশিত অবস্থাও শুধরে যাবে। তারা পাত্রী দেখে ইলমুদ্দিনের বিয়ের কথাবার্তা পাকাপোক্ত করে ফেলেন।

একরাতের কথা, ইলমুদ্দিন স্বপ্নে দেখে, এক বুযুর্গ এসে তাকে বলছেন, "ইলমুদ্দিন, এখনও ঘুমিয়ে আছো?! দুশমন তোমার নবির শানের খেলাফ প্রোপাগান্ডায় লিপ্ত। উঠো। জলদি করো।"

ইলমুদ্দিনের ঘুম ভেঙ্গে যায়। উত্তেজনায় তার সারা শরীর ঘেমে ভিজে যায়। সে অস্থির হয়ে পড়ে। এরপর ঘুমানোর চেষ্টা করেও আর ঘুমাতে পারে না। অনন্তর উঠে সরাসরি শেদার ঘরে পৌঁছে। শেদাকে নিয়ে ভাটি দরজার কাছে যায়। এরপর তাকে সব খুলে বলে। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, ইলমুদ্দিন রাতে যে স্বপ্ন দেখেছে, হুবহু একই স্বপ্ন শেদাও দেখেছে। স্বপ্নে দেখা বুযুর্গ উভয়কে একই আদেশ দিয়েছেন। তারা উভয়েই পেরেশান। এবার কে তাহলে এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেবে। দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। উভয়ই এই গুরুদায়িত্ব নিজ হাতে সম্পন্ন করতে চাচ্ছিলো। আখের আলোচনার মাধ্যমে কোনো ফায়সালা করতে না পেরে তারা লটারি করে। লটারিতে ইলমুদ্দিনের নাম ওঠে। শেদার অনুরোধে পুনরায় লটারি করা হয়। এবারও ইলমুদ্দিনের নাম ওঠে। শেদার পীড়াপীড়িতে তৃতীয়বার লটারি করলে এবারও ইলমুদ্দিনের নাম ওঠে। ইলমুদ্দিন নিশ্চিন্ত হয়ে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে বাড়িতে ফেরে।

আবারও ইলমুদ্দিন স্বপ্ন দেখে, সেই বুযুর্গ এসে তাকে বলছেন, "উঠো! জলদি করো! দেরি করবে তো অন্য কেউ এসে বাজি নিয়ে যাবে!"

ইলমুদ্দিন শেষবারের মতো শেদার সাথে দেখা করে। স্মৃতির নিদর্শনস্বরূপ তাকে একটি ছাতা এবং একটি ঘড়ি উপহার দেয়। এরপর তার কাছ থেকে শেষ বিদায় নেয়। রাতে তার দু'চোখে ঘুম আসে না। ভাবনায় ভাবনায় কোনোমতে রাতটা কাটিয়ে দেয়।

পরবর্তী দিন ৬ এপ্রিল ১৯২৯ তারিখে ইলমুদ্দিন সকালবেলা ঘর থেকে বের হয়। গুমটি বাজারের দিকে যায়। আত্মারাম কামারের দোকানে গিয়ে সেখান থেকে নিজের পছন্দমতো একটি ছুরি কিনে। কাঠমিস্ত্রি হওয়ার সুবাদে ছুড়ি-চাকু সে ভালোমতোই চিনতো। ছুরি কেনার পর সে অনেকটা আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তৎক্ষণাতই হাসপাতাল রোডে পৌঁছে। আনারকলি হাসপাতাল রোডে ইশরত পাবলিশিং হাউজের সামনেই রাজপালের অফিস ছিলো। সেখানে পৌঁছে ইলমুদ্দিন জানতে পারে, রাজপাল এখনও আসেনি। আর যখন সে আসে, তখন তার হেফাজতে পুলিশও এসে হাজির হয়। ইতোমধ্যে রাজপালের অফিসের সামনে এসে একটি কার থামে। ইলমুদ্দিন জানতে পারে, কার থেকে যে লোকটা নামছে, সে-ই রাজপাল। এই নরাধমই রাসুলের শানে গোস্তাখিমূলক বই প্রকাশ করেছে এবং তা নামমাত্র মূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করেছে।

রাজপাল গাড়ি থেকে নেমে সাহেবের মতো দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে। অফিসে ঢুকে নিজের চেয়ারে বসে পুলিশকে তার আগমনের কথা জানানোর জন্য টেলিফোন উঠানোর কথা ভাবছে— এমন সময় ইলমুদ্দিন দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে। সেসময়ে অফিসে দু'জন কর্মচারী ছিলো। কুদারনাথ পেছনের কামরায় বইপত্র রাখছিলো আর ভগতরাম রাজপালের পাশেই দাঁড়ানো ছিলো। রাজপাল এক তরুণকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেখে, কিন্তু সে ভাবতেই পারে না যে, মৃত্যু তার এতোই কাছে। ইলমুদ্দিন ভেতরে প্রবেশ করে চোখের পল পড়ার আগেই জামার ভেতর থেকে ছুরি বের করে। তার হাতটা উঁচুতে উঠে যায় এবং মুহূর্তের মধ্যেই ধারালো ছুরির আঘাত রাজপালের বুকে গিয়ে বিদ্ধ হয়। ছুরির ফলা রাজপালের কলজে ভেদ করে। এক আঘাতেই আহ শব্দ উচ্চারণ করে রাজপালের দেহ মুখ থুবড়ে যমিনে পড়ে। ইলমুদ্দিন দ্রুত পেছনে ফিরে দোকান থেকে পলায়ন করে। দোকানের দুই কর্মচারী বাইরে এসে চিৎকার করতে থাকে, "ধরো! ধরো! ... মেরে ফেলেছে! মেরে ফেলেছে!" কাশ্মীর থেকে রাসকুমারি পর্যন্ত চারিদিকে দাবানলের মতো গাজি ইলমুদ্দিনের বাহাদুরির কথা ছড়িয়ে যায়। সর্বত্র এই ইমানদীপ্ত তরুণের কালজয়ী কারনামার কথা আলোচনা হতে থাকে। গাজি ইলমুদ্দিন নবিপ্রেমের নযরানা পেশ করার অপরাধে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়।

পাঁচ.

স্বভাবত আদালতের কার্যক্রম কচ্ছপের থেকে ধীরগতিসম্পন্ন হলেও এক্ষেত্রে আদালত ছিলো বড়ই সোচ্চার। গাজি খোদাবখশ এবং গাজি আব্দুল আজিজের ক্ষেত্রে গ্রেফতারের সপ্তাহখানেকের মধ্যেই তাদের ফায়সালা শুনিয়ে দেয়া হয়। ফিরিঙ্গিদের আদালতের রঙ্গমঞ্চে তাদের উভয়ের ক্ষেত্রেই তাদের পক্ষে কোনো ওকিলকে দেখা যায় না। গাজি ইলমুদ্দিনের ক্ষেত্রেও প্রথমে এমনই হয়। ১০ এপ্রিল ১৯২৯ তারিখে গাজি ইলমুদ্দিনকে সর্বপ্রথম আদালতে ওঠানো হয়। ইমানের চেতনার দাবিতে অবশেষে গাজি ইলমুদ্দিনের পক্ষে একঝাঁক মুসলিম ওকিল সাড়া দেন। ব্যারিস্টার খাজা ফিরোজ উদ্দিন, ব্যারিস্টার ফারাখ হুসাইন এবং তাদের সহযোগিতায় ডা. এ আর খালেদ, মাস্টার সেলিম এবং আরো কয়েকজন আল্লাহর বান্দা এই মামলার পক্ষে লড়ার সিদ্ধান্ত নেন। ওকিলরা গাজি ইলমুদ্দিনের পক্ষে অসীম সাহসিকতার সাথে লড়াই করেন। অসংখ্য দলিল ও আইনের ধারা পেশ করেন। কিন্তু ফায়সালা তো পূর্বনির্ধারিত। ৯ মে ১৯২৯ তারিখে গাজি ইলমুদ্দিনের ব্যাপারে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়।

ব্যারিস্টার ফারাখ হুসাইন মোম্বাই গিয়ে ওকিল (পরবর্তীতে কায়িদে আজম) মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর সাথে সাক্ষাত করেন। গাজি ইলমুদ্দিনের পক্ষে হাইকোর্টে আপিল দায়ের করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ তার প্রস্তাবে সম্মত হন। লাহোর হাইকোর্টে আপিল করেন। যথাসময়ে শুনানি হয়। মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ আদালতে বলেন, "ইওর অনার! ইসলামের নবি রাসুলুল্লাহ সা. এর শানে গোস্তাখি করা এবং জনসাধারণের মধ্যে দ্রোহের আগুন উসকে দেয়া ১৩৫ ধারার আলোকে দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু এতোদসত্ত্বেও প্রকাশক রাজপালের বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। আইনের নিস্তব্ধতাই গাজি ইলমুদ্দিনকে আইন নিজ হাতে তুলে নিতে অনুপ্রাণিত করেছে। এজন্য গাজি ইলমুদ্দিনের অপরাধকে ৩০২ ধারায় মার্ডার গণ্য না করে ৩০৮ ধারায় এজিটেশন কিলিং গণ্য করা উচিত, যার শাস্তি বেশি থেকে বেশি সাত বছর কারাদণ্ড হতে পারে। তাছাড়া গাজি ইলমুদ্দিনের যে বয়স, তাতে সে মৃত্যুদণ্ডের আইনের আওতাভুক্তও নয়।"

লাহোর হাইকোর্টের কট্টর হিন্দু জাস্টিস শাদিলাল কোনো কথায় কর্ণপাত না করে আপিল খারিজ করে দেয়। এরপর ফাঁসির জন্য গাজি ইলমুদ্দিনকে মিয়ানওয়ালি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ৩১ অক্টোবর ১৯২৯ তারিখে গাজি ইলমুদ্দিনের ফাঁসি

কার্যকর করা হয়। মাত্র একুশ বছর বয়সী অতি সাধারণ মুসলিম কাঠমিস্ত্রি গাজি ইলমুদ্দিন রাসুলের মহব্বতে শাহাদতের অমীয় সুধা পান করে সবুজ পাখির ভেতর প্রবিষ্ট হয়ে জান্নাতে বিচরণ করার সৌভাগ্য লাভ করে।

ফাঁসি কার্যকর করার পর সেখানেই জানাযা ছাড়া গাজি ইলমুদ্দিনকে দাফন করা হয়। এদিকে তার শাহাদাতের খবর দাবানলের মতো সারা হিন্দুস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। শহিদের লাশ তার ওসিয়ত মোতাবেক লাহোরে দাফন করার দাবিতে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়। মুসলমানরা আল্লামা ইকবালের নেতৃত্বে বরকত আলী মোহামেডান হলে সমাবেশ ঘোষণা করে। ১ নভেম্বর আল্লামা ইকবালের বাসভবনে জলসা সংঘটিত হয়। ২ নভেম্বর আল্লামা ইকবালের দাবিতে প্রোফেশনাল মুসলিম লীগের কাউন্সিলে ফিরিঙ্গি সরকারের থেকে শহিদের লাশ আদায়ের ব্যাপারে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হয়। ৫ নভেম্বর আল্লামা ইকবাল, স্যার মুহাম্মাদ শফি, মিয়াঁ আব্দুল আজিজ, মাওলানা গোলাম মুহিউদ্দিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গভর্নরের সাথে সাক্ষাত করে সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে শহিদের লাশ সমর্পণের জন্য আবেদন করেন। অবশেষে বাধ্য হয়ে ইংরেজ সরকার শাহাদাতের ১৪ দিন পর মুসলমানদের কাছে শহিদের লাশ অর্পণ করে। শহিদের লাশ কবর থেকে উঠিয়ে ট্রেনে লাহোরে নিয়ে যাওয়া হয়। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুসারে গাজি ইলমুদ্দিনের জানাযায় ছয় লক্ষ মুসলমান অংশগ্রহণ করে। লাহোরের ভাটিচক থেকে শুরু করে সুমনাবাদ পর্যন্ত পুরো এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। জানাযা শেষে আল্লামা ইকবাল এবং সায়্যিদ দিদার আলী শাহ নিজ হাতে শহিদের লাশ কবরে রাখেন। যখন তার লাশ কবরে রাখা হচ্ছিলো, তখন মাওলানা যফর আলী খান চিৎকার করে বলে ওঠেন, "হায়! আজ এই মর্যাদা যদি আমার নসিবে জোটতো!" ঠিক সেই মুহূর্তেই আল্লামা ইকবালের যবান থেকে উচ্চারিত হয়—

اسی گلاں ای کر دے رہ گئے تے تر خاناں دامنڈابازی لے گیا

আমরা পরিকল্পনাই বানাতে থাকি আর এক কাঠমিস্ত্রির ছেলে এসে মর্যাদা লুফে নিয়ে যায়।

১৪ নভেম্বর ১৯২৯ তারিখে গাজি ইলমুদ্দিন শহিদ রহ. এর পবিত্র লাশকে তার ওসিয়ত মোতাবেক লাহোরের ভাওয়ালপুর রোডের নিকটস্থ মিয়ানি সাহেব কবরস্থানে দাফন করা হয়। মহান আল্লাহ এই নবিপ্রেমিক খুদে শহিদের সমাধির ওপর অজস্র রহমত বর্ষণ করুন। আমিন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৭১৭৭

এক জীবন্ত শহীদের গল্প {না শুনলে চরম মিস করবেন}

AL-ANSAR

Senior Member

০৭-০৩-২০১৭

কুরাইশদের প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান তালহা (রা.) । তাঁর চাচা হযরত খাদীজার ভ্রাতা নওফল ইবনে খুয়াইলিদ ছিল কুরাইশ সিংহ নামে খ্যাত । মাসউদ ইবনে খারাশ বলেন, একদিন সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সায়ী করছিলাম, দেখলাম একদল লোক হাত পা বেধে একটি যুবককে নিয়ে আসছে উপুড় করে ।

বেদমভাভে প্রহার করছে । আর একটি মহিলা গলা ফাটিয়ে গালাগালি দিচ্ছে আমি জিজ্ঞাসা করলাম ছেলেটির কি হয়েছে?

তারা বললঃ এ হচ্ছে তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ সে নাকি বাপ দাদার ধর্ম ত্যাগ করে মুহম্মদ বিন আবদুল্লাহর নবুওয়াতের উপর ঈমান এনেছে ।

আর কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনকারী মহিলাটি তার মা সাবা বিনতে আল হাদরাসী ।

__ইসলামের প্রতি তার অনুরাগ ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর ভালবাসা ছিল সীমাহীন ।

তার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি ছিল চমকপ্রদ, তিনি বলেন, ব্যবসা উপলক্ষে আমি তখন বসরায় । একজন বয়স্ক খ্রিষ্টান পাদ্রী বাজারে আগত লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের মধ্যে মক্কাবাসী কোন লোক আছে নিকা?

নিকট থেকে আমি বললাম, হা আমি মক্কার অধিবাসী, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের মধ্যে “আহ্*মদ” নামে আখেরী রাসূল কি আত্মপ্রকাশ করেছেন?

আমি আবার বললাম কোন আহমদ, তিনি বললেন, ‘আহ্*মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব’ । এটা তার আত্মপ্রকাশের মাস । তিনি হবেন আখেরী রাসূল । মক্কায় জাহের হবেন কিন্তু খেজুর উদ্যান বিশিষ্ট ভূমির দিকে হিজরত করবেন । যাও তার সাথে সাক্ষাৎ কর ও তাকে সাহায্য কর ।

তার কথা আমার অন্তর আলোকিত হলো।

_ইসলাম কবুর করার পর বাইয়াতে রিদওয়ান, খাইবার, মুতাসহ সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

_ওহুদের যুদ্ধ!

যুদ্ধের মাঠে আওয়াজ উঠল মাহাম্মদ (স.) শহীদ হয়ে গেছেন। যে ১০/১২জন বীর অটল ও অবিচল হয়ে রাসূল (স.) কে ঘিরে রেখেছিলেন হযরত তালহা তাদের অন্যতম।

-তালহা (রা.) উন্মাদ হয়ে রাসূলুল্লাহর দিকে নিক্ষিপ্ত তীরগুলোকে নিজ পিঠে ধারণ করতে ছিলেন যেন রাসূলকে স্পর্শ করতে না পারে আর কটিন ভাভে শত্রুকে প্রতিহত করতে ছিলেন।

অসহ্য অবস্থায় নিজেকে বলছিলেন, "হে তালহা! আমি কি আমার রক্ত, গোশত ও জীবনকে রাসূলের জন্য ওয়াক্*ফ করে দেইনি"? শেষে হযরত তাহলা রাসূল (স.) কে নিজের কাধে বহন করে পাহাড়ের পাদদেশে নিয়ে রাখলেন।

ইতিমধ্যে আবু বকর (রা.) রাসূলকে খেদমত করতে দৌড়ে আসলে নবীজি (স.) বললেন, 'আমাকে নয়, তোমরা তালহাকে দেখ"।

আবু বকর (রা.) বললেন, আমি দেখি তালহা একটি গর্তে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন।

একটি হাতের সমস্ত আঙ্গুল নেই, সারা শরীর তীর নেজার আঘাতে জর্জরিত"

রাসূলুল্লাহ তার সম্পর্কে বলেছিলেন,

যদি কেউ কোন মৃত ব্যাক্তিকে পৃথিবীতে হেটে বেড়াতে দেখতে চাও তবে ঐ তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহকে দেখ" তাই তাকে জীবন্ত শহীদ বলা হয়"।

ইসলাম ও মুসলমানেরা আজ ইতিহাসের এক কঠিন সময় যাচ্ছে। খ্রিষ্টান, ইয়াহুদী মুশরিকরা আজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তাদের Common শত্রু মুসলমানদের বিনাশ সাধনে।

একদিকে তারা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে রেখেছে অনৈক্যের দাউ দাউ আগুন।

অপরদিকে আমাদের রাষ্ট্রপতি ও শাসকদের মাথা তারা ক্রয় করে তাদের গোলামীতে নিয়োজিত রেখেছে।

আবার মুসলিম চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিকসহ জাতীয় সচেতন অংশের বিরাট অংশকে অঢেল অর্থ, আন্তর্জাতিক পুরস্কার,, নারী, গাড়ী ও বাড়ী ইত্যাকার ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে বন্ধক রেখে তাদের জবান,

কলম ও মস্তিষ্ককে মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে অতি স্বার্থকভাবে ব্যবহার করছে।

আর যাদেরকে কোন কিছুর বিনিময়ে ক্রয় করা যায়নি; যাদেরকে কোন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী পুন:জাগরণের জিহাদী আন্দোলন থেকে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি তাদেরকে দুনিয়োর শ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসী, মৌলবাদী বলে প্রথমে চিহ্নিত করা ও হত্যা :arge: করার জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে।

---এমন পরিস্থিতিতে ভয় পেলে চলবে না-----

----তালহা (রা.) এর মত একজন জীবন্ত শহীদ হতে হবে—

আজ ইসলামকে ঘিরে সে হিম্মত ও সবরের সথে ময়দানে দাড়াবার ডাক এসেছে।

আর ইসলামের দিকে নিক্ষিপ্ত শত্রুদের কামানের উত্তপ্ত গোলা নিজ বক্ষে ধারণ করার ও

বীরত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত উপস্থাপনই আজকের সময়ের প্রয়োজন।

আল্লাহ কবুল করুন। আমীন।

আনসার কে ভালবাসা ঈমানের অংশ।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৭২৬৫

একাত্তরের ইতিহাসঃ অধ্যায়- ১০ঃ মুক্তিযুদ্ধে ইসলাম শূণ্যতা।

৭১ এর ইতিহাস

Member

১২-০১-২০১৭

সংকট ইসলামশূণ্যতার

বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে সবচেয়ে বড় সংকটটি ছিল আদর্শের। সেটি ইসলামশূণ্যতার। যে কোন মুসলিমের জন্য এটি এক বিশাল সমস্যা। ঈমানদারদের জন্য এ যুদ্ধে অংশ নেয়ার কোন জায়েজ পথ খোলা রাখা হয়নি। ঈমানদারদের জন্য প্রতিটি খাদ্যকে যেমন সম্পূর্ণ হালাল হতে হয়,তেমনি প্রতিটি যুদ্ধকেও বিশুদ্ধ জিহাদ হতে হয়। নইলে সে যুদ্ধে প্রাণ দূরে থাক একটি পয়সা, একটি ঘন্টা বা একটি মুহূর্তের বিনিয়োগও জায়েজ হয় না। মুসলমানের জান-মাল ও প্রতিটি সামর্থ্যই মহান আল্লাহতায়ালার দেয়া নিয়ামত। ব্যক্তির উপর মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে অর্পিত এটি আমানতও। ব্যক্তি এখানে ট্রাস্টি বা রক্ষক মাত্র, মালিক নয়। প্রতিটি আমানত কীরূপ ব্যয় হলো সে হিসাবটি প্রকৃত প্রভূ মহান আল্লাহতায়ালার কাছে আখেরাতে দিতে হবে। তাই মুসলিম মাত্রই যুদ্ধে প্রাণ দিবে একমাত্র মহান আল্লাহতায়ালার পথে; নইলে সে মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের পথে -যা পরকালে জাহান্নাম প্রাপ্তিকে সুনিশ্চিত করবে।তাই ঈমানদারের প্রতিটি প্রচেষ্টা ও যুদ্ধকে হতে হয় ইসলামকে প্রতিষ্ঠা দেয়া বা মুসলিম ভূমিকে প্রতিরক্ষা দেয়ার স্বার্থে। ভাষা, বর্ণ, গোত্র বা কোন সেক্যুলার লক্ষ্যে নয়। কারণ, মুসলিমের কাছে একমাত্র হালাল বা কোরআন-নির্ধারিত মতবাদটি হলো ইসলাম;জাতীয়তাবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, সেক্যুলারিজম বা কম্যুনিজম নয়।তাই মু'মিনের জানমাল ও সামর্থ্যের উপর ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন মতবাদ ও ধর্মের অধিকার থাকে না।

ঈমানদার হওয়ার অর্থ, নিজের জানমাল ও শক্তি-সামর্থ্য কোথায় এবং কার স্বার্থে বিনিয়োগ হলো -সর্বমুহূর্তে সে জবাবদেহীতার চেতনা নিয়ে বাঁচা। ইসলামের বিজয়ে সে কতটা ভূমিকা রাখলো –মু'মিনের জীবনে মূল যিকর বস্তুত সেটিই।যার মধ্যে সে যিকর নাই,বুঝতে হবে তার মধ্যে ঈমানও নাই। মানব রূপে জন্ম নেয়ার

এটিই বিশাল দায়ভার, এ দায়ভার পশুর থাকেনা। যে মানব সন্তানের মাঝে সে দায়ভার নাই,মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে তাকে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট বলেছেন। মহান আল্লাহতায়ালার প্রতিটি আমানতের উপর একমাত্র অধিকার তাঁর; ফলে প্রতিটি মুসলিমকে একমাত্র তাঁর নির্দেশিত পথে সে আমানতের ব্যয় নিয়ে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। নইলে সেটি পরিণত হয় ভয়ানক খেয়ানতে। এমন প্রতিটি খেয়ানতই কবিরা গুনাহ -পরকালে যা কঠিন শাস্তিকে অনিবার্য করে। তাই মু'মিন ব্যক্তির ঈমানী দায়ভার হলো,মহান আল্লাহতায়ালা-প্রদত্ত প্রতিটি আমানতকে সর্বপ্রকার খেয়ানত থেকে বাঁচানো। এটিই প্রকৃত ঈমানদারী। তাই জীবনের প্রতি পদে, প্রতিটি কর্মে, প্রতিটি যুদ্ধে এবং রাজনীতির প্রতিটি অঙ্গনে মুসলিম ও ইসলামের কল্যাণের বিষয়টিকে সবার শীর্ষে রাখতে হয়। এমন এক মহৎ লক্ষ্যের কারণেই প্রতিটি মুসলিম রাজনীতিবিদই ইসলামের মুজাহিদ;এবং তার প্রতিটি যুদ্ধই পবিত্র জিহাদ। সে জিহাদে নিহত হলে প্রত্যেকেই শহিদ।

মু'মিনের চেতনার এ ভূমি কি তাই জাতীয়তাবাদ, সেক্যুলারিজম বা সমাজবাদের ন্যায় মতবাদ দ্বারা অধিকৃত হতে পারে? হয়নি একাত্তরেও। মুক্তিযুদ্ধের পিছনে যে দর্শনটি কাজ করেছিল,মু'মিনের চেতনা-রাজ্যে প্রবেশের সে সামর্থ্য তার ছিল না।

একাত্তরের মুক্তি যুদ্ধের দর্শনগত ভিত্তি ছিল ইসলামের বদলে সেক্যুলার জাতীয়তাবাদ। এর রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রকে খণ্ডিত করে ইসলামে অঙ্গীকারশূণ্য সেক্যুলার বাংলাদেশ নির্মাণ। যুদ্ধটির প্রশিক্ষণ, অর্থ ও অস্ত্রের জোগানদার ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুর্তিপূজারী অধ্যুষিত ভারত। সে যুদ্ধে যারা অংশ নিয়েছিল তাদেরকে ভারত যে শুধু আশ্রয় দিয়েছিল তাই নয়, তাদের রাজনৈতিক অভিভাবক রূপেও আবির্ভূত হয়েছিল। কাফেরদের রাজনীতির মূল এজেন্ডা তো ইসলাম ও মুসলিমের ক্ষতিসাধন। যেখানেই তারা মুসলিমের সামান্যতম স্বার্থ দেখে,তারা তার বিরোধীতা করে। ভারতীয় হিন্দুগণ তাই শুরু থেকেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধীতা করেছিল। এবং কখনোই চায়নি দেশটি বেঁচে থাকুক। অথচ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারিরা মুসলিম-বিরোধী ভারতের কোলে গিয়ে উঠে। প্রশ্ন হলো, এমন একটি কাফের নিয়ন্ত্রিত যুদ্ধে ও কাফেরদের নেতৃত্বে জান ও মালের বিনিয়োগ কি জায়েজ?

মহান আল্লাহতায়ালা কি তাতে খুশি হন?

একাত্তরে এ প্রশ্নটি ছিল প্রতিটি ঈমানদারের। এ বিষয়ে মহান আল্লাহতায়ালার কঠোর হুশিয়ারিটি হলো, "মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে ব্যক্তি এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না...।"–(সুরা আল ইমরান,আয়াত ২৮)।

পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না...।"–(সুরা মুমতাহানা আয়াত ১)।

একাত্তরে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ নিজেদের মুসলিম রূপে দাবী করলেও তাদের কাছে মহান আল্লাহতায়ালার এ কঠোর নির্দেশনামা কোনরূপ গুরুত্বই পায়নি। বরং পবিত্র কোরআনের নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই ছিল তাদের রাজনীতি। ফলে ভারতীয় কর্তা ব্যক্তিদের নিছক বন্ধু রূপে নয়, প্রভু রূপে গ্রহণ করেছিল। এবং সেটি ছিল নিছক গদির লোভে। ইসলাম ও মুসলিমের স্বার্থ এখানে গুরুত্ব পায়নি। ইসলামী চেতনাধারির কাছে বিষয়টি এতোটাই দৃষ্টুকটু ও হারাম গণ্য হয়েছিল যে তাদের একজনও ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেয়নি, এবং ভারতের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র নিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে অংশও নেয়নি। একাত্তরে সেটি ছিল চোখে পড়ার মত বিষয়।

জিহাদ বনাম মুক্তিযুদ্ধ

আওয়ামী লীগ নেতারা নিজেরাও কখনো একাত্তরের যুদ্ধকে জিহাদ বলে দাবী করেনি। যারা নিজেদেরকে একাত্তরের চেতনার ঝান্ডাবাহি মনে করে, তারা আজও সেটি বলে না। বরং তাদের ভাষায় এ যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল ইসলামী চেতনা ও সে চেতনা-নির্ভর পাকিস্তানের ধ্বংস করে একটি সেক্যুলার বাংলাদেশ নির্মাণ। এটিকেই তারা একাত্তরের চেতনা বলে দাবী করে। এ বিষয়গুলি একাত্তরে ইসলামী দলগুলির নেতাকর্মী ও আলেমদের কাছে অজানা ছিল না। এমন যুদ্ধে একজন ঈমানদার ব্যক্তি তাই অংশ নেয় কি করে?

কেনই বা বিনিয়োগ করবে তার মহামূল্য জীবন?

মহান আল্লাহতায়ালার দেয়া মহান আমানতটি একজন ঈমানদার তো একমাত্র সে যুদ্ধেই বিনিয়োগ করবে যে যুদ্ধটিকে শতকরা শত ভাগ বিশুদ্ধ জিহাদ এবং সংঘটিত হয় একটি মুসিলম দেশের প্রতিরক্ষায় এবং মুসলিম উম্মাহ শক্তিবৃদ্ধিতে।

এ বিষয়গুলিকে সামনে রেখেই তৎকালীন নেজামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় সভাপতি ও কিশোরগঞ্জের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা আতাহার আলী এবং আরো বহু আলেম মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়াকে হারাম বলেছেন।

যুদ্ধকালীন ৯ মাসের পত্রিকাগুলো খুললে সে সময়ের প্রসিদ্ধ আলেমদের এরূপ অভিমত বহু নজরে পড়বে। তারা বরং জিহাদ বলেছেন পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে লড়াই করাকে। একাত্তরে চোখে পড়ার মত বিষয়টি হলো, কোন একজন বিজ্ঞ আলেমও পাকিস্তান ভাঙ্গাকে জায়েজ বলেননি। দেশের ধর্মপ্রাণ জনগণ আলেমদের সে অভিমতকেই গ্রহণ করে নেয়। তারই প্রমাণ, ইসলামী জ্ঞানশূণ্য ও ইসলাম প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারশূণ্য বহু আওয়ামী লীগ কর্মী, বামপন্থী ক্যাডার ও নাস্তিক মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলেও কোন একজন আলেম, মাদ্রাসার কোন ছাত্র, পীরের কোন মুরিদ এবং ইসলামী দলের কোন নেতা বা কর্মী ভারতে যায়নি এবং মুক্তিযুদ্ধেও যোগ দেয়নি। তারা বরং রাজাকার হয়েছে। একাত্তরের যুদ্ধকে তাই বাঙালী-অবাঙালীর যুদ্ধ বলাটি নিরেট মিথ্যা। এটি ছিল একটি আদর্শিক সংঘাত। তাই জেনারেল মানেক শ', জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং জেনারেল জ্যাকবের ন্যায় বহু হাজার ভারতীয় অমুসলিম অবাঙালী যেমন বাঙালী মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে লড়েছে, তেমনি বহু হাজার বাঙালী পূর্ব পাকিস্তানীরাও লড়েছে পশ্চিম পাকিস্তানী পাঞ্জাবী, পাঠান ও বেলুচী মুসলিমদের সাথে। ভাষার বিভেদ ও আঞ্চলিকতা তাদের মাঝে কোন দেয়াল খাড়া করেনি। অথচ বাংলাদেশের সেক্যুলারিস্টদের রচনায় এ যুদ্ধটিকে নিছক বাঙালীর বিরুদ্ধে পাঞ্জাবীর যুদ্ধ বলে রটনা করা হয়েছে। অথচ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দুই শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও জেনারেল নিয়াজী –এ দুই জনের কেউই পাঞ্জাবী ছিলেন না, তারা ছিলেন পাঠান।

জিহাদ বলতে একমাত্র সে যুদ্ধকেই বুঝায় যা লড়া হয় একমাত্র মহান আল্লাহতায়ালাকে খুশি করার লক্ষ্যে এবং তাঁরই নির্দেশিত পথে। কোন দল, জাতি, বর্ণ, ভাষা বা ভূগোল ভিত্তিক স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে নয়। অর্থদান, শ্রমদান, প্রাণদান কোন জাতির ইতিহাসেই নতুন কিছু নয়। অসংখ্য যুদ্ধ যুগে যুগে কাফের, ফাসেক, মুনাফিকগণও লড়েছে। আজও লড়ছে। বিপুল অর্থ, শ্রম ও রক্ত তারাও ব্যয় করে। কিন্তু তাদের সে ত্যাগ ও কোরবানী হলো আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথে। ফলে তা হলো আমানতের খেয়ানত। সেক্যুলার দলের হাতে তাই কোন দেশ অধিকৃত

হলে সেখানে সে খেয়ানতটাই প্রচণ্ড ভাবে বাড়ে। তখন যুদ্ধ হয় এবং বিপুল অর্থ ও রক্তের ব্যয়ও হয়।কিন্তু সেগুলি হয় ভাষা, ভূগোল, দল, গোত্র, বর্ণ ও শ্রেণী স্বার্থের নামে। তাতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা পায় না,আর ইসলাম প্রতিষ্ঠা না পেলে কি মুসলিমের কল্যাণ হয়?

তাতে খুশি হন কি মহান আল্লাহতায়ালা?

অধিকাংশ মুসলিম দেশে মুসলিমদের সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা হচ্ছে তো মূলত এপথে। আওয়ামী লীগও তেমনি নিজেদের গদীর স্বার্থে এবং সে সাথে ভারতকে খুশি করতে গিয়ে জাতিকে এক প্রচণ্ড খেয়ানতের দিকে ধাবিত করেছে। কথা হলো, মহান আল্লাহর দরবারে তাদের জবাবটি কি হবে?

আপোষে অনাগ্রহ

বাঙালী মুসলিমের বহু ব্যর্থতাই অতি প্রকট ভাবে ধরা পড়ে একাত্তরে। তবে মূল ব্যর্থতাটি ধরা পড়ে ইসলামী চেতনা ও প্যান-ইসলামীক ভাতৃত্ব নিয়ে বেড়ে না উঠায়। প্রকাশ পায় আপোষে অনাগ্রহ। বাংলাদেশের সেক্যুলারিস্টগণ আজও সে রোগ থেকে মুক্তি পায়নি। বরং দিন দিন তা আরো প্রকটতর হয়েছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সেক্যুলারিস্টগণ জনগণ ভাষা ও অঞ্চলের পরিচয়কেও জীবনের বড় পরিচয় গণ্য করে। ছুঁড়ে ফেলে দেয় মুসলিম ভাতৃত্বের পরিচয়। অথচ ভাষা, বর্ণ, গোত্র বা অঞ্চলের ভিত্তিতে যে বন্ধন গড়ে উঠে সেটি প্রাক-ইসলামিক নিরেট জাহেলিয়াত তথা অজ্ঞতা।

ইসলামের আগমন ঘটে এমন জাহিলিয়াতকে নির্মূল করতে, পরিচর্যা দিতে নয়। প্রশ্ন হলো, ঈমানদারের জীবনে এমন জাহিলী পরিচয় গুরুত্ব পায় কি?

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহতায়ালার সুস্পষ্ট নির্দেশটি হলো মু'মিনকে বাঁচতে হবে পরস্পরে ভাইয়ের পরিচয় নিয়ে, শত্রু রূপে নয়। ভাতৃসুলভ সম্পর্কের ভিত্তি হতে হবে ঈমান, ভাষাভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক বন্ধন নয়। ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ হতেই পারে। মহান আল্লাহতায়ালার নির্দেশ হলো সেগুলো নিয়ে ইসলাহ বা আপোষ করা।

সভ্য দেশে হাজার হাজার বিবাদের প্রতিদিন মীমাংসা হয় কোনরূপ যুদ্ধ বা সংঘাত ছাড়াই। মুসলিমদেরও উচিত,মীমাংসার পথ খুঁজে বের করা এবং নিজেদের মধ্যে

যুদ্ধ পরিহার করা। এটি এক ঈমানী দায়ভার। এর মধ্যেই তো বুদ্ধিমত্ততা। মুসলিমদের মাঝে প্রতিটি যুদ্ধই ভাতৃঘাতি। এমন যুদ্ধ স্রেফ কাফের শত্রুদের কামনা হতে পারে, মুসলিমের নয়। মু'মিন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইদের সাথে শুধু নামাযে দাঁড়ায় না, সমস্যা দেখা দিলে অধীর আগ্রহ ভরে আপোষেও বসে।

এমন রাজনীতি দেশে যুদ্ধের বদলে শান্তি ও উন্নয়ন আসে।

সমস্যা দেখা দেয় তখন যখন মহান আল্লাহতায়ালার দ্বীন পালনে আগ্রহ লোপের সাথে সাথে মুসলিম ভাইয়ের সাথে বিবাদে মীমাংসার আগ্রহটিও লোপ পায়; এবং সে বিবাদকে অজুহাত বানিয়ে কাফেরদের নেতৃত্বে মুসলিম ভাইয়ের হত্যায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নামা হয়। আপোষে আগ্রহ লোপের কারণ, মহান আল্লাহতায়ালার ভয় না থাকা। মু'মিন তো সেই, যার মাঝে প্রতিক্ষণ কাজ করে মহান আল্লাহতায়ালার অবাধ্যতা থেকে বাঁচার ভয়। সে ভয়ের কারণে মু'মিন ব্যক্তি যেখানেই মহান আল্লাহতায়ালার নির্দেশনা দেখে, অধীর আগ্রহে সেটিকেই আঁকড়ে ধরে। ইসলামী চেতনাশূণ্য সেক্যুলারিস্টদের মনে সে ভয় থাকে না, ফলে আগ্রহ থাকে না ধর্মীয় বিধান পালনে। ফলে জনগণ যতই ইসলামশূণ্য হয়,সমাজ বা রাষ্ট্র ততই বিবাদপূর্ণ ও সংঘাতপূর্ণ হয়। সেটি যেমন ১৯৭১'য়ে পূর্ব পাকিস্তানে হয়েছিল, তেমনি একাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশেও হচ্ছে। একই কারণে জাহিলিয়াত যুগের আরবদের মাঝেও লাগাতর কলহ-বিবাদ ও যুদ্ধ ছিল। অথচ মীমাংসার পথেই মহান আল্লাহতায়ালার বিশেষ রহমত আসে -পবিত্র কোরআনে যা বার বার বলা হয়েছে। নিজেদের বিবাদ নিজেরা না মিটিয়ে মুসলিম ভূমিতে অমুসলিমদের ডেকে এনে যুদ্ধ শুরু করা কোন মুসলিমের কাজ নয়। এটি তো শত্রুরা চায়। এ পথে আসে কঠিন আযাব। আসে অপমান। দুঃখজনক হলো, ইসলামী চেতনাশূণ্য আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব ও তার সঙ্গিগণ সজ্ঞানে আযাবের পথটিই বেছে নিয়েছিলেন। আপোষের পথটি ছেড়ে তারা ভারতীয় উস্কানিতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পথটি বেছে নেন।

২৩ শে মার্চের ঢাকা বৈঠকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও জনাব ভূট্টো উভয়ই ৬ দফা মেনে নিয়েছিলেন।-(Sisson and Rose, ১৯৯০]। কিন্তু শেখ মুজিব নিজেই তার ৬ দফাকে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছেন। ৬ দফার বদলে তিনি এমন দাবি পেশ করেন -যার উপর জনগণ থেকে তিনি সত্তরের নির্বাচনে কোনরূপ

ম্যান্ডেট নেননি। তার এ নীতিহীনতায় দেশে শান্তি আসেনি, এসেছে যুদ্ধ। আর যুদ্ধ কোন দেশেই একাকী আসে না। সাথে আনে ধ্বংস ও মৃত্যু। এবং যুদ্ধ শেষ হলেও আযাব শেষ হয়না। বাংলাদেশে লাগাতর আযাব এসেছে দুর্ভিক্ষ, সন্ত্রাস, ভিক্ষার ঝুলির অপমান, স্বৈরাচারের দুঃশাসন ও সীমাহীন দূর্নীতি রূপে।সে সাথে এসেছে অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ময়দানে ভারতীয় অধিকৃতি।এবং সে অধিকৃতি থেকে বাংলাদেশের জনগণের আজও মুক্তি মিলেনি।

শূন্যতা ঈমানী বন্ধনের

মহান আল্লাহতায়ালা,চান মুসলিমগণ ভাতৃত্বের বন্ধনটি গড়ে তুলুক ঈমানের ভিত্তিতে; ভাষা, বর্ণ, গোত্র বা আঞ্চলিক পরিচয়ের ভিত্তিতে নয়। একাত্তরে বাঙালী জাতীয়তাবাদীগণ সে ঈমানী বন্ধন সৃষ্টিত ব্যর্থ হয়েছে। তাদের কাছে মুসলিম রূপে বেড়ে উঠাটি গুরুত্ব পায়নি। বাঙালী জাতীয়তার নামে আওয়ামী লীগ ধরেছিল এমন এক পথ যা মহান আল্লাহতায়ালার প্রদর্শিত পথ নয়। সেটি ছিল জাহিলিয়াতের তথা ইসলামপূর্ব অজ্ঞতার পথ। বরং উনিশ শ' সাতচল্লিশে যে চেতনায় অবাঙালীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলার মুসলিমগণ পাকিস্তান নির্মাণ করেছিল -সেটিই ছিল ইসলামী পথ। মুসলিম ভাতৃত্বের চেতনায় ইসলাম যে কতবড় নৈতিক বিপ্লব এনেছিল এবং ইস্পাতসম মজবুত দেয়াল গড়েছিল সে পরিচয়টি হযরত আবু বকর (রাঃ)পাওয়া যায় হযরত আবু বকর (রাঃ) এর উক্তি থেকে।

ইসলাম গ্রহণের পর একবার'য়ের পুত্র তাঁকে বলেছিলেন,"আব্বাজান, বদরের যুদ্ধে আমি তিন বার আপনাকে আমার তরবারির সামনে পেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা। শৈশবে আপনার কত স্নেহ-আদর পেয়েছি। সেটি প্রতিবার মনে পড়ায় আঘাত না করে প্রতিবারই সরে দাঁড়িয়েছি।" শুনে হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, "পুত্র, যদি তোমাকে একটি বার তরবারির সামনে পেতাম, নিশ্চিত দুই টুকরা করে ফেলতাম।"

হযরত আবু ওবাইদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ) ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী। তিনি ছিলেন আশারায়ে মোবাশ্বেরা; অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বেই তিনি জান্নাতপ্রাপ্তির সুখবর শুনেছিলেন। নবীজী (সাঃ) তাঁকে "আমিন" উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন মুসলিম উম্মাহর বিশ্বস্ততার প্রতীক। তাঁকে হযরত ওমর (রাঃ)

সিরিয়া অভিযানে তাকে রোমান বাহিনী বিরুদ্ধে সেনাপতি রূপে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন সিরিয়ায় প্রথম মুসলিম গভর্নর। সে বিশাল সিরিয়া প্রদেশ ভেঙ্গে আজ সিরিয়া, জর্দান, লেবানন, ইসরাইল ও ফিলিস্তিন –এ ৫টি দেশ। মৃত্যুর সময় হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন, আজ যদি আবু ওবাইদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ) জীবিত থাকতেন তবে তাঁকেই খলিফা নিযুক্ত করতাম। সে প্রসীদ্ধ সাহাবীর পিতা মুসলমান হননি। বরং বদর যুদ্ধে কাফের বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে মুসলমানদের নির্মূলকল্পে অস্ত্র ধরেছিলেন। হযরত আবু ওবাইদুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতাকে সে যুদ্ধে নিজ হাতে হত্যা করেছিলেন। ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থের প্রতি এর চেয়ে বিশ্বস্ততা আর কি হতে পারে? তাঁর এক ভাই বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়েছিল।এক আনসারি তাকে রশি দিয়ে বাঁধছিলেন। হযরত আবু ওবাইদুল্লাহ (রাঃ) সে আনসারি সাহাবী বল্লেন, "ওকে শক্ত করে বাঁধ। তার মা অর্থশালী, অনেক মুক্তিপণ আদায় করতে পারবে।" তাঁর কথা শুনে তার ভাই বললো, তুমি আমার ভাই; আর তুমি এরূপ কথা বলছো?" হযরত আবু ওবাইদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, "না, তুমি আমার ভাই নও; আমার ভাই তো ঐ আনসারি যে তোমাকে বাঁধছে।" ঈমানের বন্ধন বন্ধুত্ব ও শত্রুর সংজ্ঞাটি এভাবেই ভিন্নভাবে চিহ্নত করে।

যুদ্ধের ময়দানে হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর নিজ কাফের পুত্রকে হত্যার যে অভিব্যক্তিটি প্রকাশ করেছেন এবং হযরত আবু ওবাইদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ) তাঁর নিজ কাফের পিতাকে যেরূপ হত্যা করেছেন -তা হলো সাচ্চা ঈমানদারী। সে ঈমানদারীতে কোন রূপ সংশয় বা অপূর্ণতা ছিল না। অপর দিকে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পুত্র যা বলেছেন সেটি ছিল জাহেলিয়াত। জাহেল ব্যক্তি ভাষা, বর্ণ, ভৌগোলিকতা, পরিবার বা গোত্রের মধ্যে সম্পর্ক খোঁজে। জাতীয়তাবাদ তাই আধুনিক নয়, বরং অতি সনাতন জাহেলিয়াত। প্যান-ইসলামীক চেতনার বিরুদ্ধে এটি হলো মারাত্মক ব্যাধি। মুসলমান রাষ্ট্রগুলিতে বিভেদ ও ভাঙ্গন ছাড়া এটি আর কোন কল্যাণটি করেছে? যেখানে এরূপ জাতীয়তাবাদী জাহেলিয়াতের বিকাশ ঘটেছে সেখানেই একাত্তরের ন্যায় আত্মঘাতি রক্তপাতও ঘটেছে। এক রাষ্ট্র ভেঙ্গে জন্ম নিয়েছে বহু রাষ্ট্র। এ ভাবে মুসলিম বিশ্বজুড়ে বেড়েছে ক্ষুদ্রতা। ক্ষীণতর হয়েছে বিশ্বশক্তি রূপে মুসলমান উম্মাহর উত্থানের সম্ভাবনা।

অপর দিকে যেখানেই ইসলামের মৌলিক শিক্ষার বিকাশ ঘটেছে সেখানেই বেড়েছে প্যান-ইসলামীক চেতনা। তখন নানা ভাষাভাষী মুসলমানের মাঝে একতাও গড়ে উঠেছে। ১৯৪৭-পূর্ব ভারতীয় মুসলিমেদের মাঝেও সেটিই হয়েছিল।

ফলে বাঙালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি,বেলুচী, পাঠান, গুজরাতী -সবাই কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে এক রাষ্ট্রের নির্মাণও করেছে। বাঙালী মুসলিমগণ সেদিন ভারত থেকে আসা ভাইদের জন্য সর্বপ্রকার সহায়তা দিয়েছে। এমন ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নামিয়ে আনে মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত নিয়ামত।সে নিয়ামতের বরকতেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় হিন্দু কংগ্রেসের যৌথ বিরোধীতার মুখে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান। নইলে নিরস্ত্র ও পশ্চাদপদ মুসলমানদের পক্ষে কি সম্ভব হত সে রাষ্ট্রের নির্মাণ? সুলতান মুহম্মদ ঘোরির হাতে দিল্লি বিজয়ের পর উপমহাদেশের মুসলিম ইতিহাসে এটিই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা; এবং সবচেয়ে বড় বিজয়।

দায়ী কি স্রেফ পশ্চিম পাকিস্তানীরা?

পাকিস্তান গড়ার পিছনে উচ্চতর ভিশন ছিল। শুধুমাত্র উপমহাদেশের মুসলিমদের কল্যাণে নয়, দেশটির প্রতিষ্ঠা কালে গুরুত্ব পেয়েছিল সারা পৃথিবীর মজলুম মুসলিমদের স্বার্থ সংরক্ষণে শক্তিশালী ভূমিকা নেয়ার বিষয়টিও। কিন্তু সে ভূমিকা পালনে পাকিস্তান ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদের কি সাহায্য করবে, দেশটি নিজেই টিকে থাকতে পারেনি। পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ায় মৃত্যু ঘটেছে একটি বিশাল স্বপ্নের –যা দেখেছিল উপমহাদেশের মুসলিমগণ। তবে সে ব্যর্থতার জন্য কি শুধু পশ্চিম পাকিস্তানীগণ দায়ী? পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানী হওয়ায় সে ব্যর্থতার জন্য বেশী দায়ী হলো পূর্ব পাকিস্তানীরা। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার যুক্তি দেখিয়ে অনেকে পাকিস্তানের ক্রিকেট এবং হকির টিমে সংখ্যানুপাতিক হারে পূর্ব পাকিস্তানী খেলোয়াড় নেয়ার দাবী তুলেছে। কিন্তু সে জন্য যে ভাল খেলোয়াড় হওয়ারও প্রয়োজন রয়েছে -সে বিষয়টি ক'জন অনুভব করেছে? এরূপ ব্যর্থতা সর্বক্ষেত্রে। ঠিকমত খেলেনি কোন খেলাই। রাজনীতির ময়দানে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের সদস্যগণ তো সংসদের ভিতরে খুনোখুনিও করে বসে। নিহত হয় ডিপুটি স্পীকার শাহেদ আলী। পশ্চিম পাকিস্তানে তখন ৪টি প্রদেশ ছিল, কিন্তু কোন প্রদেশের সংসদে কি এমন খুনোখুনি হয়েছে?

বিবাদ ও বিভক্তির সূত্রগুলো খুঁজে খুঁজে বাঙালী সেক্যুলারিস্টগণ সেগুলিকে শুধু রাজনীতিতেই কাজে লাগায়নি, তা নিয়ে দাঙ্গাও সৃষ্টি করেছে। অবাঙালীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াতে ও তাদের বিনিয়োগে রোধে বাঙালী-অবাঙালী দাঙ্গা সৃষ্টি করেছে আদমজী জুটমিলে। পুঁজি চায় শিল্পাঙ্গণে নিরাপত্তা। কিন্তু আওয়ামী লীগ সে পরিবেশও বিনষ্ট করেছে। ফলে পাকিস্তান সৃষ্টির সাথে সাথে যে গতিতে পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প কারখানার প্রতিষ্ঠা শুরু হয়েছিল সেটিও দ্রুত কমিয়ে দিতে সমর্থ হয়। অথচ দাঙ্গার সবচেয়ে উর্বর ক্ষেত্র ছিল করাচি। সেখানে সিন্ধি, মোহাজির, পাঠান, পাঞ্জাবী, আফগান, বাঙালী –এরূপ নানা ভাষাভাষি বিপুল সংখ্যক মানুষের বসবাস। মুসলিম বিশ্বের আর কোন শহরে এতো ভিন্নতা নাই। মুসলিম হওয়ার অর্থই হলো কসমোপলিটন হওয়া, তথা নানা ভাষাভাষী মানুষের সাথে শান্তিপূর্ণ বসবাসে অভ্যস্থ হওয়া। বিভক্তির দেয়াল ভেঙ্গে একাকার হওয়াই তো মুসলিম সংস্কৃতি। কিন্তু বাঙালী মুসলিমগণ সে কসমোপলিটন মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠতে পারিনি, বরং গড়েছে বিভক্তির দেয়াল। ফলে বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে এক ভাষা ও এক বর্ণের ট্রাইবাল দেশ রূপে। ফলে কয়েক লক্ষ বিহারী বাংলাদেশে নিরাপত্তা পায়নি। প্রাণ বাঁচাতে এসেও বাংলাদেশের সীমান্তে প্রবেশাধিকার পায়নি প্রতিবেশী মজলুম রোহিঙ্গাগণ। তাদের নৌকাগুলোকে সাগরে ভেসে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। এমন স্বার্থপর মানসিকতা কি মহান আল্লাহতায়ালার সাহায্য আনে?

করুণাময় মহান আল্লাহতায়ালা তো তাদেরই সাহায্য করেন যারা তাঁর বিপন্ন বান্দাদের সাহায্য করে। -(হাদীস)।

আরো বিপদ হলো, এরূপ চেতনাগত ও চারিত্রিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মাঝে আত্মচিন্তা বা আত্মসমালোচনাও নাই। বরং বিপুল আয়োজন সে রোগকে আরো তীব্রতর করায়। নিজ রোগ নিয়ে রোগীর নিজের ভাবনা না থাকলে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেসক্রিপশনই বা কি কল্যাণ করতে পারে? অথচ সে প্রেসক্রিপশনটি তো সর্বরোগের মুক্তিদাতা মহান আল্লাহতায়ালার। মানব-সন্তান উন্নত মানবতা পায় উন্নত দর্শনের গুণে;ভাষা বা জলবায়ুর গুণে নয়। দর্শনই দেয় চিন্তা, চেতনা ও চরিত্রে পরিশুদ্ধি। সে দর্শনটি তাই বিশুদ্ধ ও উন্নত হওয়া জরুরী। সমগ্র মানব ইতিহাসে মুসলিমগণ শ্রেষ্ঠ এজন্য যে তাদের হাতে রয়েছে শ্রেষ্ঠ জীবন দর্শন -যা এসেছে মহাজ্ঞানী মহান রাব্বুল আলামীন থেকে। কিন্তু ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সে শ্রেষ্ঠত্ব থাকে না। ইসলামের গৌরব যুগে

মুসলিমগণ ইসলামী আদর্শ ও প্যান-ইসলামীক ভাতৃত্বের পথ ধরেই মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা গড়েছিলেন এবং সেসাথে বিশ্বশক্তির মর্যাদা পেয়েছিলেন; জাতীয়তা বা সেক্যুলারিজমের মাধ্যমে নয়।

মুসলিমদের সে গৌরবময় অতীত ইতিহাস থেকে বাঙালী সেক্যুলারিস্টগণ কোন শিক্ষাই নেয়নি। মানব-ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে মিশরীয়গণ কাগজ আবিষ্কার করেছিল,নবীজীর (সাঃ) জন্মের কয়েক হাজার বছর আগে যারা ভাষা ও ভাষালিপির জন্ম দিয়েছিল এবং পিরামিডের ন্যায় বিস্ময়কর ইমারত গড়েছিল - তারাও ইসলামের সন্ধান লাভের সাথে সাথে নিজ ভাষা,নিজ সংস্কৃতি ও নিজ সনাতন বিশ্বাসকে কবরস্থ করেছিল। মহান আল্লাহতায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ দান কোরআনী জ্ঞান থেকে সমৃদ্ধ হওয়ার স্বার্থে তারা আরবী ভাষাকে নিজেদের ভাষা রূপে গ্রহণ করেছিল। একই পথ ধরেছিল সুদান, লিবিয়া, আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো, মৌরতানিয়াসহ সমগ্র উত্তর আফ্রিকার জনগণ। সে আমলের মুসলিমগণ বিশ্বশক্তি ও বিশ্বসভ্যতা রূপে প্রতিষ্ঠা পায় তো এভাবেই। শত শত নদী যেমন সাগরে মিশে বিশালতা দেয়, মুসলিম উম্মাহও তেমনি নানা জনগোষ্ঠীর মিলনে বিশালতা পায়। ইসলামী উম্মাহর মূল দর্শন তো এটিই।

বিভক্তি ও ভাতৃঘাতী সংঘাতই আজকের মুসলিমদের প্রধানতম রোগ যা তাদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে এবং সামর্থ কেড়ে নিয়েছে মাথা তুলে দাঁড়ানোর। এক ভাষা, এক বর্ণ, এক ধর্ম ও এক অখণ্ড ভূগোল হওয়া সত্ত্বেও আরবগণ ২২ টুকরোয় বিভক্ত। তাতে বিশ কোটির বেশী আরব এতটাই শক্তিহীন হয়েছে যে অর্ধকোটি ইহুদী তাদের মাথার উপর বিজয়ী শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। শক্তি একতার মাঝে;পাকিস্তান আজও তার উত্তম দৃষ্টান্ত। একাত্তরে পাকিস্তান খণ্ডিত হলেও প্যান-ইসলামী চেতনার দিক দিয়ে অবশিষ্ঠ পাকিস্তান আজও সমগ্র মুসলিম বিশ্বে অনন্য। পৃথিবীর ৫৭টি মুসলিম দেশের মাঝে পাকিস্তানই সবচেয়ে শক্তশালী দেশ। কারণ, এটিই একমাত্র দেশ যেখানে পাঞ্জাব, সিন্ধু, খায়বর-পাখতুন'খা ও বেলুচিস্তান -এ চারটি প্রদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষি ১৯ কোটি মানুষ এক অভিন্ন রাষ্ট্রের পতাকা তলে বসবাস করছে। অথচ পাকিস্তানের প্রতিটি প্রদেশই আলাদা রাষ্ট্র নির্মাণের সামর্থ রাখে। আলাদা হলে প্রত্যেকটির আয়োতন বিশ্বের শতকরা ৭০ ভাগ রাষ্ট্রের আয়োতনের চেয়ে বড় হত। দেশটির ৪টি প্রদেশের মাঝে দু'টির আয়োতন বাংলাদেশের চেয়ে বড়। তারপরও তারা একতাবদ্ধ আছে। দেশটি তার

জন্ম থেকেই ভারতীয়, রোহিঙ্গা, আফগানসহ নানা দেশের মুসলিমদের নিজ দেশের নাগরিক রূপে বরণ করে নিয়েছে।

যুদ্ধ চলাকালে ৩০ বছরেরও বেশীকাল ধরে পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিল ৩০ লাখের অধীক আফগান মোহাজির। রাশিয়ার বিরুদ্ধে দীর্ঘ ১০ বছরের লড়াইয়ে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছে পাকিস্তানের নাগরিকগণ।আফগানিস্তানের জিহাদে বহু হাজার পাকিস্তানী শহীদ হয়েছে।দেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হককেও প্রাণ দিতে হয়েছে। দেশটির সরকার ও নাগরিকগণ আজও সহায়তা দিয়ে যাচেছ ভারতীয় অধিকৃতির বিরুদ্ধে। নানারূপ ব্যর্থতার পরও এটি কি কম অর্জন? অথচ বাংলাদেশে কয়েক লাখ রোহিঙ্গা ও বিহারী মোহাজির নিদারুন অবহেলা ও দুর্দশার শিকার।

প্রতিবন্ধকতা বুদ্ধিবৃত্তিতে

বাঙলী সেক্যুলারিস্টদের মূল রোগটি হলো বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধকতার। এমন প্রতিবন্ধকতার কারণে লোপ পেয়েছে নিজেদের ব্যর্থতাগুলি নিয়ে চিন্তা ভাবনার সামর্থ। সে ব্যর্থতাগুলোকে স্বচোখে দেখেও তা নিয়ে তারা গর্ব করে। এজন্যই তাদের প্রচণ্ড গর্ব মুজিবের ন্যায় বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যর্থ ও অপরাধী ব্যক্তিকে নিয়ে। যে ব্যক্তির দুঃশাসন একটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ উপহার দিল, নারীদের বাধ্য করলো জাল পড়তে,চাপিয়ে দিল একদলীয় বাকশালী স্বৈরাচার, হত্যা করলো ৩০ হাজারের বেশী রাজনৈতিক নেতাকর্মী, দেশকে পরিণত করলো ভিক্ষার তলাহীন ঝুলি -তাকেই তারা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী বলে। বাংলার সমগ্র ইতিহাসে আর কোন শাসকের হাতে এতো বড় ভয়ানক দুর্যোগ কি কখনো এসেছে? একই রূপ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধকতার কারণে একাত্তরের ব্যর্থতাগুলোও এসব বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বৃত্তদের নজরে পড়েনি। বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধকতা তাদেরকে শুধু বিবেকহীনই করেনি, অতিশয় ভীরুও বানিয়েছে। ফলে কাশ্মীরে ভারতীয় জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করতেও ভয় পায়। ভারতে শত শত মুসলমান খুন হয়,মহিলাগণ ধর্ষিতা হয় এবং ধর্ষণের পর আগুণে নিক্ষিপ্ত হয়।সে নৃশংসতার বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে প্রবল প্রতিবাদও হয়।কিন্তু নিরব থাকে বাংলাদেশের সেক্যুলারিস্ট সরকার ও মিডিয়া। মিয়ানমারে নির্মূলের মুখে পড়েছে সেদেশের রোহিঙ্গা মুসলিমগণ। সে বর্বরতার বিরুদ্ধেও তারা নিরব।

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের পক্ষ থেকে প্রতিবেশী দেশের মজলুমদের প্রতি এই কি দায়িত্বপালনের নমুনা? আগ্রহ যেন হাত পেতে স্রেফ নেয়ায়, দেয়াতে নয়। অথচ জুলুমের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদটি স্রেফ রাজনীতি নয়, এটি গভীর ঈমানী দায়বদ্ধতা। ব্যক্তির বিবেক সুস্থ ও ইসলামি জ্ঞানে পরিপুষ্ট হলে জুলুমের বিরুদ্ধে সে ব্যক্তি প্রতিবাদী হবেই। সিরিয়ায় যুদ্ধ শুরুর পূর্বে সমগ্র বিশ্বে উদ্বাস্তুদের সর্ববৃহৎ আবাসস্থল ছিল পাকিস্তান। (সূত্রঃ জাতিসংঘ রিপোর্ট)।

বর্তমানে সেটি তুরস্ক। দেশটি প্রতিষ্ঠার পরপরই প্রায় ৭০ লাখ ভারতীয় আশ্রয় নিয়েছিল। আশীর দশকে আশ্রয় পেয়েছে ৩০ লাখ আফগানী। একাত্তরে বাঙালী-অবাঙালী রক্তাক্ষয়ী সংঘাতের পরও বহুলক্ষ বাঙালী আজ পাকিস্তানে বসবাস করছে। এসব বাঙালীদের অধিকাংশই পাকিস্তানে গেছে একাত্তরের পর। নানা ব্যর্থতার পরও প্যান-ইসলামীক চেতনা যে দেশটিতে এখনও বেঁচে আছে এ হলো তার নজির।

একাত্তর নিয়ে যেসব লেখালেখি হয়েছে তাতে বাঙালীর দুর্বলতাগুলো তুলে ধরা হয়নি। বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে সেটি সম্ভবও নয়। ফলে এ হিসাব কখনই নেয়া হয়নি, বাঙালী মুসলিমগণ হাত পেতে বিশ্ব থেকে যতটা নিয়েছে, ততটা দিয়েছে কি? দিয়েছে কি এক কালের নিজ দেশ পাকিস্তানের শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য, শিক্ষা ও প্রতিরক্ষার উন্নয়নে? এমন কি খেলাধুলায়? অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে তাদের দেয়ার দায়িত্বটাই কি অধিক ছিল না? তাদের থেকে সেটিই কি পাকিস্তানের পাওনা ছিল না? আদমজী, বাওয়ানী, দাউদ, ইস্পাহানীদের ন্যায় অবাঙালীরা এসে কেন পূর্ব পাকিস্তানে এসে শিল্পায়ন করবে? তারা তো ছিল সংখ্যালঘু। সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্বপাকিস্তানীদের কি পুঁজি, যোগ্যতা ও কারগরি দক্ষতা নিয়ে পশ্চিম-পাকিস্তানী ভাইদের শিল্পায়নে এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল না? পশ্চিম পাকিস্তানী সৈনিকেরা এসে কেন চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা পাহারা দিবে? অথচ ২৩ বছরের পাকিস্তানী আমলে সেটাই হয়েছে।

এমনকি চোরাকারবারি রোধে ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ব্যর্থতা দেখে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন জিওসি জেনারেল ওমরাও খানের কাছে সীমান্ত পাহারায় সেনাবাহিনী নিয়োগের অনুরোধ করেছিলেন তৎকালীন আওয়ামী

লীগ দলীয় পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান।-(আতাউর রহমান খান, ২০০০)।

বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মনে এসব ব্যর্থতা নিয়ে কখনো কি কোন আত্মজিজ্ঞাসা উদয় হয়েছে? নিজেদের ব্যর্থতার কারণ ও তার প্রতিকারের চেষ্টা না করে তারা বরং দুর্বলতা ও দোষ অন্বেষণ করেছে অন্যদের। আর এটিই হলো সকল যুগের সকল ব্যর্থ ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীর চিরাচরিত খাসলত। প্রো-এ্যাকটিভ না হয়ে তারা বরং রিয়াকটিভ হয়। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী সেক্যুলার মহলটি আজও সে অসুস্থ চেতনারই পরিচর্যা দিচ্ছে।

বিভক্তি যে কারণে অনিবার্য হলো

বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধকতার মূল কারণটি বাঙালী জাতিয়তাবাদ। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ব্যক্তির দেখবার ও ভাবনার ভূবনে বিভক্তির বিশাল দেয়াল খাড়া করে। সেটি ভাষা, ভূগোল ও বর্ণের ভিত্তিতে। বিবেকে প্রতিবন্ধকতা নিয়ে তখন দেয়ালের ওপারে অন্যদের যেমন দেখা যায় না, তেমনি তাদের নিয়ে ভাবাও যায় না। ফলে ভাববার ও দেখবার জগত তখন অতি সীমিত হয়ে যায়। মানব জীবনে এর চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধকতা আর কি হতে পারে? তাই বাঙালী জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিদের চেতনারাজ্যে বিহারীদের জন্য যেমন স্থান নেই, তেমনি স্থান নেই কাশ্মীরী ও রোহিঙ্গাদের জন্যও। স্থান নেই স্বদেশী ইসলামপন্থীদের জন্যও।

এরূপ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধকতায় ডঃ শহিদুল্লাহ তৎকালীন বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ যে কতটা আক্রান্ত হয়েছিল তার একটি উদাহরণ দেয়া যাক। সেটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক জনাব থেকে। তিনি লিখেছেন,"আমরা হিন্দু মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে তা মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো টি নেই।" (বদরুদ্দীন উমর, ১৯৭০)।

এই হলো, ডঃ শহীদুল্লার বুদ্ধিবৃত্তি ও ইসলামী জ্ঞানের দশা! তিনি ঈমানী পরিচয়ের চেয়ে বেশী সত্য বানিয়ে দিলেন বাঙালী পরিচয়কে! পৌত্তলিক হিন্দুদের ন্যায় প্রকৃতিকেও তিনি মা বলেছেন।তাহলে বংকিম চন্দ্রের বন্দেমাতরম বা মাতৃবন্দনা থেকে তার পার্থক্য কোথায়? প্রশ্ন হলো এটি কি ঈমানের পরিচয়? অথচ তিনি বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের শিরোমণি।

মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে ব্যক্তির দৈহিক গঠনে আঞ্চলিকতার প্রভাবের কি আদৌ গুরুত্ব আছে? আদৌ গুরুত্ব পায় কি তার বর্ণ ও ভাষাভিত্তিক পরিচয়? তা নিয়ে কি বড়াই করা চলে? সেখানে গুরুত্ব পায়তো ঈমানদারী ও নেক আমল। গুরুত্ব পায় কে কতটা সাচ্চা মুসলিম -সেটি। কোন ভাষার,কোন দেশের,কোন বর্ণের বা কোন আকৃতির -তা নিয়ে পরকালে কোন বিচার বসবে না। কথা হলো, আখেরাতে যার মূল্য নেই সেটি ইহকালেই বা গুরুত্ব পায় কি করে? ঈমানদার ব্যক্তি কেন তার নিজের সময়, সম্পদ ও মেধা সেটির পিছনে খরচ করবে? ভাষা বা বর্ণের পরিচয়টি তাই গুরুত্বের দিক দিয়ে প্রথম হয় কী করে? ঈমানদার তো বাঁচবে একমাত্র মহান আল্লাহতায়ালাকে খুশি করার লক্ষ্যে। ফলে মু'মিনের জীবনে তো সেটিই গুরুত্ব পায় যা মহান আল্লাহতায়ালার কাছে গুরুত্ব রাখে এবং পরকালের মুক্তিতে যা অপরিহার্য। ঈমানদারীর অর্থ তো বাঁচবার প্রতি মুহূর্তে এবং জীবনের প্রতি কর্মে এরূপ পরকাল সচেতনতা। আর এর বিপরীতে যেটি, তা হলো ইহজাগতিকতা বা সেক্যুলারিজম। সেক্যুলারিজমে ব্যক্তি ভাষা, বর্ণ ও আঞ্চলিকতা গুরুত্ব পায় এবং গুরুত্ব হারায় ধর্মের প্রতি অঙ্গীকার।

বাংলাদেশের মুসলিম রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীগণ যে কতটা বিভ্রান্ত এবং ইসলামের মৌল দর্শনে যে কতটা অজ্ঞ ও অঙ্গীকারশূন্য -বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের গুরুতুল্য ব্যক্তি জনাব ড.শহিদুল্লাহর উপরের উদ্ধৃতি হলো তারই সুস্পষ্ট নমুনা। ফলে কায়েদে আযম মোহম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর নিজ ভাষা, নিজ বর্ণ, নিজ মাজহাব ও আঞ্চলিকতার উর্দ্ধে উঠে যেরূপ নেতৃত্ব দিতে পেরেছিলেন, বাঙালী জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা ও বুদ্ধিজীবীগণ তা পারেনি। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার কারণে পাকিস্তানকে গড়ে তোলার বৃহত্তর দায়িত্ব ছিল বাঙালীদের উপরই। অথচ তারা আত্মসমর্পণ করেছেন ভাষাভিত্তিক ক্ষুদ্রতা, বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতার কাছে। পাকিস্তানের উন্নয়নে তারা কি দিয়েছ বা তাদের কি করণীয় -সেটি তাদের কাছে আদৌ গুরুত্ব পায়নি। বরং গুরুত্ব পেয়েছে কি পায়নি -তা নিয়ে। সমৃদ্ধ

পাকিস্তান গড়তে ২৩ বছরে বাঙালীগণ কি দিয়েছে -তা নিয়ে কোন প্রশ্ন নাই। সে বিশলা ব্যর্থতা নিয়ে বাংলাদেশের মুসলিম বুদ্ধিজীবী মহলে সমান্যতম আত্মসমালোচনাও নেই। বরং আছে শুধু অন্যদের উপর দোষারোপ।

পাকিস্তানের মূল সমস্যাটি তাই ভৌগলিক ব্যবধান ছিল না। ভাষা, বর্ণ, খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদের ভিন্নতাও নয়। বরং সেটি ছিল চেতনাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক বৈষম্য ও অসমতা। চেতনাগণ সে ভিন্নতার কারণেই বাঙালী মুসলিমগণ অবাঙালী মুসলিমদের সাথে একাত্ম হতে পারিনি। ফল ছিটকে পড়েছে মুসলিম শক্তি রূপে বেড়ে উঠার নানা ভাষাভাষি মুসলিমের সম্মিলিত মিশন থেকে। খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ বা ভাষাগত ভিন্নতা কি ভারতে কম? বরং সেটি বিশাল। ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব প্রান্তের দ্বীপটি থেকে পশ্চিম প্রান্তের দ্বীপের দূরত্ব ঢাকা-লাহোরের দূরত্বের চেয়েও অধিক। পাঞ্জাব থেকে বাংলাদেশের দূরত্বের চেয়েও অধিক হলো ভারতের পূর্ব সীমান্তের অরুনাচল প্রদেশ থেকে গুজরাটের দূরত্ব। ভারতে বিস্তর ভেদাভেদ ভাষার ক্ষেত্রেও। কিন্তু সে জন্য কি প্রশাসনে কোন অসুবিধা হচ্ছে?

বাঙালীর ১৯০ বছরের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল ইংল্যান্ডের সাথে। তাতেও কি প্রশাসনে কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে?

তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো, শক্তিশালী মুসলিম শক্তি রূপে বেড়ে উঠার বিকল্প কি ক্ষুদ্রতর ও দুর্বলতর বাংলাদেশ?

ক্ষুদ্রতর হওয়ার পথ বেছে নেয়ায় ভারতকে খুশি করা যায়, তা নিয়ে মুজিবের ন্যায় বাকশালী স্বৈরাচারীকেও ক্ষমতায় বসানো যায়। কিন্তু সে পথে কি মহান আল্লাহতায়াকেও খুশি করা যায়?

তিনি তো চান মুসলিম উম্মাহর মাঝে ঐক্য। বিভক্তি ও ক্ষুদ্রতার মাঝে যে মহান আল্লাহতায়ার ভয়ানক আযাব –সেটি তো মহান আল্লাহতায়ার হুশিয়ারি। (সুরা আল ইমরান, আয়াত ১০৫ দ্রষ্টব্য)।

প্রশ্ন হলো, নিছক অবাঙালী হওয়ার কারণে কোন মুসলিম ব্যক্তি কি মুসলমানের দুশমন হতে পারে? দুশমন হওয়ার জন্য কি ভাষা বা বর্ণই মূল? স্বভাষী, স্বদেশী, এমনকি প্রতিবেশীও তো পরম দুশমন হতে পারে। নবীজীকে (সাঃ)কে যারা

হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল তারা শুধু আরবই ছিল না, বরং ছিল তাঁর নিকটতম আত্মীয়, স্বগোত্রীয় এবং অতি নিকটতম প্রতিবেশী।

অথচ নবীজী(সাঃ)র সাহায্যে যারা অর্থ ও নিজ প্রাণসহ সর্বস্ব দানে এগিয়ে এসেছিলেন তারা ছিলেন দূরবর্তী মদিনার মানুষ। তাঁর পাশে প্রাণপণে দাঁড়িয়েছিলেন রোমের শোহাইব, আফ্রিকার বেলাল এবং ইরানের সালমান। এটিই ইসলামের বিশ্বভাতৃত্ব। কিন্তু ভাষা, বর্ণ বা অঞ্চলভিত্তিক সংকীর্ণতা নিয়ে কি অতি কাছের ভিন্ ভাষী মুসলিমদের সাথেও একত্রে রাজনীতির সামর্থ্য আসে?

ঘরের পাশে বসবাসকারি নিরপরাধ বিহারী ব্যক্তিটিও তখন শত্রু ও হত্যাযোগ্য বিবেচিত হয়। একাত্তরে সে অপরাধে বহু লক্ষ বিহারী মুসলিমের শুধু ঘরবাড়িই কেড়ে নেয়া হয়নি, বহু হাজার বিহারীর প্রাণও কেড়ে নেয়া হয়েছে। বহু অবাঙালী নারীর সম্ভ্রমও কেড়ে নেয়া হয়েছে। একাত্তরে পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার মূল কারণটি তাই বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের এরূপ চেতনাগত প্রতিবদ্ধকতা এবং সে সাথে অবাঙালী বিরোধী ভয়ানক অপরাধ-প্রবনতা।তা থেকেই জন্ম নেয় চরম পাকিস্তান বৈরী মনোভাব। ৬ দফা মেনে নিয়েও তাই অখণ্ড পাকিস্তান বাঁচানো যায়নি। পাকিস্তানের বিভক্তি ও একাত্তরের বিপর্যয় বুঝতে হলে বাঙালী জাতীয়তাবাদী সেক্যুলারিস্টদের এ বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বৃত্তি ও প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

বদরুদ্দীন উমর,১৯৭০;পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ঢাকা-১।

Sisson, Richard and Leo Rose (১৯৯০): War and Secession: Pakistan, India and the Creation of Bangladesh, University of California; Berkeley.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮৩১৪

একাত্তরের ইতিহাসঃ অধ্যায়ঃ ১৭- ভারতীয় ' র ' এবং 'সি আই এ ' এর ভূমিকা

৭১ এর ইতিহাস

Member

১২-২৮-২০১৭

পরিকল্পনাটি ভারতীয়

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনাটি ভারতীয়। আওয়ামী লীগ ব্যবহৃত হয়েছে সে ভারতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের হাতিয়ার রূপে। অথচ গণতান্ত্রিক সংগঠনের ক্ষেত্রে সেটি হওয়ার কথা নয়। গণতান্ত্রিক রাজনীতির মূল কথা রাজনীতিতে স্বচ্ছতা; বিদেশী এজেন্ডা পালন বা বিদেশী গুপ্তচরদের সাথে সংশ্লিষ্টতার বদলে গুরুত্ব পায় জনগণের সাথে সংশ্লিষ্টতা। অথচ শেখ মুজিবের রাজনীতির সাথে নিজ দলের নেতাকর্মীদের সংশ্লিষ্টতা ছিল অতি সামান্যই। কখনো তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন;সেটি ভাল না লাগায় সাথে সাথে প্রেসিডেন্টও হয়েছেন। কিন্তু তা নিয়ে দলীয় নেতাদের ডেকে পরামর্শ নেননি। সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে বাকশাল প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আবির্ভূত হয়েছেন নির্ভেজাল স্বৈরাচারী রূপে। স্রেফ ভোটের জন্য জনগণের কাছে ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু দেশের ভাগ্য নির্ধারণে দেশের বিজ্ঞজন বা জনগণের মতামতের তোয়াক্কা করেননি। সেটি একাত্তরে যেমন নয়, তেমনি একাত্তরের আগে বা পরেও নয়। পরামর্শ করেছেন ভারতীয় গুপ্তচরদের সাথে। সে লক্ষ্যে ষাটের দশকেই তিনি ভারতে গেছেন। ভারত সরকার ১৯৪৭ থেকেই পাকিস্তান ভাঙ্গার চেষ্টায় ছিল। শেখ মুজিব সে কাজে ভারতের সহযোগী হন। এ নিয়ে শুধু ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’য়ের কর্মকর্তাগণই শুধু মুখ খুলেনি, মুখ খুলেছে বাংলাদেশের বহুনেতাও। পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ভারতীয় নাশকতা নিয়ে এক কালের আওয়ামী লীগ নেতা ও দলটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও পরবর্তীতে জাতীয় লীগ নেতা জনাব অলি আহাদ বলেন, “১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থানকালে ময়মনসিংহ নিবাসী রাজবন্দীদ্বয় আব্দুর রহমান সিদ্দিকী ও আবু সৈয়দের নিকট হইতে আমি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বিষয়াদী অবগত হই।

ভারতে মুদ্রিত বিচ্ছিন্নতাবাদ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন ময়মনসিংহ ও বিভিন্ন জেলায় বিতরণকালেই তাহারা গ্রেফতার হইয়াছিলেন।"-(অলি আহাদ)। যে মিথ্যাচারটি একাত্তরে দেশ জুড়ে ছড়ানো হয়েছে তা হলো, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে বাংলাদেশের সৃষ্টি মূলত মুক্তিবাহিনীর অবদান। ভারতের নাম তারা সহজে মুখে আনে না। পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশটি সৃষ্টির মূল কাজটি যে নেহায়েতই ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাজ -সে কথাটি ভারতীয় কতৃপক্ষও খুব একটা জোরে শোরে প্রচার করে না। তারা জানে,সেটি প্রকাশ পেলে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের কাছেই শুধু নয়, মুসলিম বিশ্বেও ভারত ভিলেন রূপে চিত্রিত হবে। এজন্যই বাংলাদেশ সৃষ্ঠিকে তারা বাংলাদেশীদের একান্ত নিজেদের কাজ বলে চালিয়ে দিতে চায়। কিন্তু ভারত সরকার সত্য বিষয়টি লুকাতে পারেনি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও বিপুল সংখ্যক রাজাকারদের কারণে সে পরিকল্পনা সফল হতে পারেনি। মুক্তিবাহিনীর কাঁধে বন্দুক রেখে পাকিস্তান বাহিনী বা রাজাকারদের পরাজয় করা সম্ভব হয়নি। একাত্তরের শেষদিকে তাই স্বয়ং ভারতীয় বাহিনীকেই যুদ্ধে নামতে হয়েছে। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বাঙালী ও পাকিস্তানীদের লড়াই না হয়ে পাকিস্তান ও ভারতের সরাসরি লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। এ লড়ায়ে পাকিস্তানের পরাজয়ের ফলে সৃষ্টি হয় বাংলাদেশ। সেটি আরো পরিস্কার হয়, রেসকোর্সের ময়দানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার জেনারেল অরোরা এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বভাগের কমান্ডার জেনারেল নিয়াজীর মধ্যকার চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে।এ চুক্তির মধ্য দিয়ে পাকিস্থানী সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে।

রেসকোর্সে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার জেনারেল ওসমানীর উপস্থিতি ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে যে অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক ছিল সেটির সুস্পষ্ট দলিল হলো ১৬ই ডিসেম্বরের এ চুক্তি। ভারত যেভাবে তার আগ্রাসী চরিত্রটি বিশ্ববাসীর কাছ থেকে লুকাতে চেয়েছিল সেটি সম্ভব হয়নি। ফলে মুসলিম বিশ্বের কোন দেশই বাংলাদেশকে প্রথমে স্বীকৃতি দেয়নি। অথচ এর আগে বা পরে অন্য কোন মুসলিম দেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি নিয়ে কখনোই্ এরূপ ঘটনা ঘটেনি। নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মুসলিম দেশকে তাবত মুসলিম দেশ সাথে সাথে স্বীকৃতি দিয়েছে। কারণ, একটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা-প্রাপ্তি শুধু সে দেশটির জনগণের জন্যই নয়,সমগ্র মুসলিম উম্মাহর কাছেও সেটি অতিশয় আনন্দের ঘটনা। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে

সেটি হয়নি। না হওয়ার কারণ, তাদের কাছে বাংলাদেশ পরিচিতি পেয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে অধিকৃত পূর্ব পাকিস্তান রূপে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপসারণ এবং পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের পরই অন্য মুসলিম দেশগুলো বাংলাদেশের স্বীকৃতি দানে এগিয়ে আসে। অথচ এ বিষয়টি বাংলাদেশের ইতিহাসে নাই, ছাত্রদেরকে ইচ্ছা করেই তা পড়ানো হয় না। লক্ষ্যণীয় হলো ১৬ই ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনী যে সত্যটিকে লুকাতে পারিনি, বাংলাদেশের ইতিহাসের বইয়ে সেটিই লুকানো হচ্ছে। পাঠ্য পুস্তকে মুক্তিবাহিনীর সেক্টর কমান্ডারদের কোথায় কে লড়াই করেছেন সে বিবরণ থাকলেও ভারতীয় বাহিনীর হাজার হাজার সৈন্য ও তার কমান্ডারগণ কে কোথায় কি ভাবে যুদ্ধ করলো –সে বিবরণ নাই। বিবরণ নাই, ভারতীয় বিমান ও নৌবাহিনীর ভূমিকার। একাত্তরের যুদ্ধে কতজন ভারতীয় সৈন্য প্রাণ দিয়েছে, কতজন আহত হয়েছে -স্কুলের পাঠ্যবইয়ে সে তথ্যও নাই। বুঝা যায়, সরকার ইচ্ছা করেই কিছুই লুকাতে চেয়েছে। সেটি বাংলাদেশের জন্মে ভারতের ভূমিকার কথা। কারণটিও বোধগম্য। ষড়যন্ত্র কথা তো প্রকাশ করা যায় না; সেগুলো গোপন রাখাই নিয়ম।একাত্তরের যুদ্ধের বহু ঘটনাই তা ইতিহাসের বইয়ে নাই।

ইতিহাসের বইয়ে যে সত্য বিষয়টি কখনোই বলা হয়নি না তা হলো, ভারতীয় সেনাবাহিনীর অনুপ্রবেশের পূর্বে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে ৯ মাসে পুরা বাংলাদেশ দূরে থাক একটি জেলা, একটি মহকুমা বা একটি থানাও মুক্ত করা সম্ভব হয়নি। কোন জেলা শহরে মুক্তিবাহিনীর কোন সদস্য দিবালোকে প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে ঘুরতে পারিনি। একাত্তরের মূল লড়াইটি লড়েছে ভারতীয় সেনা বাহিনী। তবে ভারত শুরু থেকেই একটি মুসলিম দেশ ভাঙ্গার অপরাধ কাঁধে নিতে চায়নি। কারণ এটি জাতিসংঘ সনদ ও আন্তর্জাতিক আইনের খেলাপ। একই কারণে চীনা বা রুশ বাহিনী ভিয়েতনামে প্রবেশ করেনি। একটি দেশের ভূগোলে কিভাবে পরিবর্তন আনতে হবে জাতিসংঘের বিধানে তার একটি বিধিবদ্ধ আইন আছে। সেটি কখনই কোন বিদেশী শক্তির আগ্রাসনের মাধ্যমে নয়। ভারত-ভাগের পূর্বে সে ইস্যুর উপর গণভোট হয়েছে, পাকিস্তানের ১৯৭১'য়ের নির্বাচন সেরূপ ছিল না। নির্বাচন হয়েছিল স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে। কিন্তু ভারত সে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায়। এজন্য যুদ্ধ চলা কালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের অধিকাংশ সদস্য পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতার প্রতিসমর্থন

জানিয়েছে। ভারতের পক্ষে থেকেছে শুধু সোভিয়েত রাশিয়া ও তার কিছু মিত্র দেশ।

লুকাতে পারিনি অপরাধ

ইতিহাসে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে -এ ভয়েই ভারত নিজেদের অর্থ, অস্ত্র ও লোকবল দ্বারা পাকিস্তান ভাঙ্গার এ যুদ্ধকে বাঙালীদের মুক্তিযুদ্ধ বলে চালানোর চেষ্টা করেছে। ভারতীয় মুসলিমগণ পাকিস্তানের উপর এমন হামলার ঘোরতর বিরোধী ছিল। তবে ভারতীয় মুসলিমগণ যাই ভাবুক, ভারতের দুশ্চিন্তার মূল কারণ, পাকিস্তানের উপর ভারতের আগ্রাসন অন্যদেরও নৈতিক বৈধতা দিবে ভারত-ভাঙ্গার যুদ্ধে অংশ নেয়ার। এজন্যই রেসকোর্সের ময়দানে জেনারেল ওসমানীকে শামিল করাটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেলগণ অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক ভাবলেও ভারতের কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে তা ছিল বড় রকমের ভুল। মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের কাঁধে বন্দুক রাখার ন্যায় তাঁর উপস্থিতিরও লোক-দেখানো রাজনৈতিক প্রয়োজন ছিল। প্রখ্যাত ভারতীয় কূটনীতিবিদ এবং ভারতীয় ইনটেলিজেন্স এর সাবেক প্রধান Mr.J.N. Dixit তার রচিত "Liberation and Beyond" বইতে জেনারেল ওসমানীকে রেসকোর্সে শামিল না করাকে "major political mistake" বলে অভিহিত করেছেন।

বাস্তবতা হলো, অতি সতর্কতার সাথে খুন করার পরও সব খুনিই খুনের আলামত ঘটনা স্থলে রেখে যায়। অপরাধ বিজ্ঞানীদের তাই বিশ্বাস, তদন্তে আন্তরিক হলে কোন খুনিই গ্রেফতার এবং সে সাথে খুনের বিচার থেকে রেহাই পেতে পারে না। অন্যদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় আগ্রাসনের সে অপরাধ যতই লুকানোর চেষ্ঠা করুক, শত শত বছর ধরে ভারত শুধু বাংলাদেশী মুসলিমদের কাছেই নয়, সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের কাছেও শত্রু রূপে চিহ্নিত হবে -তা নিয়ে কি সন্দেহ আছে?

বাংলাদেশ সৃষ্টি নিয়ে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা "র"য়ের সাবেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মিস্টার বি. রমন লিখেছেনঃ "The R&AW's success in East Pakistan, which led to the birth of Bangladesh, would not have been possible without the leadership of Kao and the ideas of Nair,"-(B.Ramon, ২০০৭)। অনুবাদঃ "পূর্ব পাকিস্তানে 'র'য়ের সাফল্যই জন্ম দেয় বাংলাদেশের; এবং কাউ'য়ের নেতৃত্ব এবং নায়ার'য়ের পরিকল্পনা ছাড়া সে সাফল্য

অর্জন সম্ভব হত না।" একাত্তর নিয়ে মিস্টার বি. রমন'য়ের মূল্যায়নে বাংলাদেশের সৃষ্টিতে মুজিবের জন্য তারা কোন স্থানই রাখেনি। অথচ বাঙালী জাতীয়তাবাদী পক্ষটি "র"এর ভূমিকার কথা মুখে আনে না। এরও গুঢ় রহস্য রয়েছে। কারণ তারা নিজেরাও জানে,এ সম্পৃক্ততা প্রকাশ পেলে আজ হোক কাল মুসলিম ইতিহাসে তারা অপরাধী রূপে চিত্রিত হবেই। কারণ ভারতের ন্যায় একটি শত্রুদেশের গুপ্তচর সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্টতা কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের জন্যই সুনাম বয়ে আনে না। যেসব ভারতীয় সেনা অফিসার ও সৈনিক কাশ্মীরে মুসলিম গণহত্যার নায়ক, তারাই একাত্তরে বাংলাদেশের সৃষ্টিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়েছিল এবং মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনীর সদস্যদের ট্রেনিং দিয়েছিল। কাশ্মীরের সে ভারতীয় খুনিদের কথা আওয়ামী ঘরানার নেতা-কর্মীরা আজ মুখেই আনে না। বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে নিজেদের অর্জন বলে অহংকার দেখায়। অথচ র'য়ের দাবি,তাদের ভুমিকাই হলো মূল। এ ব্যাপারে মিস্টার বি. রমন তার বই The Kaoboys of the R&AW, Down Memory Lane'তে লিখেছেনঃ "The IB (Intellegence Bureau) before ১৯৬৮ & the R&AW thereafter had built up a network of relationship with many political leaders and government officials of East Pakistan. The networking enabled the R&AW and the leaders and officials of East Pakistan to quickly put in position the required infrastructure for a liberation struggle consisting of a parallel government with its own fighters trained by the Indian security forces and its own bureaucracy. .. The only sections of the local population, who were hostile to India and its agencies, were the Muslim migrants from Bihar." -(B.Ramon, ২০০৭)। অনুবাদঃ ১৯৬৮ এর পূর্বে আইবি (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো) এবং পরবর্তীতে 'র' পূর্ব পাকিস্তানের বহু রাজনৈতিক নেতা এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। সে নেটওয়ার্কটি 'র' এবং (আওয়ামী লীগের) রাজনৈতিক নেতৃবর্গ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয় ত্বরিৎ বেগে নিজেদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধা ও আমলাদের দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং পাল্টা সরকার গঠনের জন্য একটি প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরিতে।....স্থানীয়

লোকদের মধ্যে একমাত্র তারাই ভারত এবং তার এজেন্সীর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল যারা বিহার থেকে আগত মোহাজির।

প্রস্তুতিটি বহু বছরের

মিস্টার বি. রমনের কথায় এটি সুস্পষ্ট যে, একাত্তরে যা ঘটেছে তার পরিকল্পনা একাত্তরে হয়নি। প্রস্তুতিটি বহু বছরের। পূর্ব পাকিস্তানকে পৃথক করার কাজ ত্বরান্বিত করার লক্ষে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা আই,বি এবং ১৯৬৮এর পর "র" ষাটের দশকের শুরু থেকেই ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে থাকে। বিচ্ছিন্ন আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাঙালী রাজনৈতিক নেতা ও সরকারি কর্মচারিদের দিয়ে তারা বিস্তৃত নেটওয়ার্ক এবং অবকাঠামো গড়ে তোলে। এমনকি ট্রেনিং দেয়ার কাজও শুরু করে। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা Director of Intelelligence Bureau (DIB) জানতে পারে যে কলকাতার ভবানীপুর এলাকার একটি বাড়ীতে - যা ছিল ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার অপারেশনাল সদর দফতর, সেখানে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নামে একটি সংগঠন কাজ করছে। তাদের লক্ষ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করা। -(মাসুদুল হক)।

মিস্টার বি. রমনের লেখা থেকে প্রমাণিত হয়, পাকিস্তানী গোয়েন্দাদের রিপোর্ট আদৌ মিথ্যা ছিল না। এ গোপন পরিকল্পনা মোতাবেক মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী রূপে দেখা ভারতের কাম্য ছিল না। শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের পিছনে তারা যে বিশাল পুঁজি বিনিয়োগ করেছিল –বিশেষ করে ১৯৭০য়ের নির্বাচনে তার মূল লক্ষ্যটি ছিল পাকিস্তান ভাঙ্গা, শেখ মুজিবকে অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা নয়। শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হলে মিস্টার বি. রমনের কথা অনুসারে র' যেভাবে পূর্বপাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা এঁটেছিল তা সফল হত না। ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার পক্ষ থেকে সে সময় ময়দানে মুজিবই একমাত্র খেলাওয়াড় ছিলেন না, ময়দানে ছিল আরো অনেকেই। ছাত্রলীগের নেতৃপর্যায়ে এদের পাল্লাই ছিল ভারি। তাদের দায়িত্ব ছিল শেখ মুজিবকে নিয়ন্ত্রণ করা, যাতে "র"য়ের সে পরিকল্পনাটি থেকে কোনরূপ বিচ্যুত না হন। বস্তুত শেখ মুজিব তখন নিজেই এক পরাধীন ব্যক্তি, তিনি ছিলেন ভারতীয় "র" এবং ছাত্রলীগ নেতাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। তখন তার পক্ষে "র"এর কাছে কৃত ওয়াদা থেকে পিছুটান দেয়ার সামান্যতম সুযোগও ছিল না। বহু আগেই ছাত্রলীগের

নেতারা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছিল। মুজিবের কাজ ছিল একজন জিম্মির ন্যায় বিনা প্রতিবাদে তাদের অনুসরণ করা। মুজিব সেটি করেছিলেনও। গাড়ীতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা টানিয়ে ইয়াহিয়ার সাথে দেখা করতে এসেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সাথে আপোষে শেখ মুজিবের আদৌ কোন আগ্রহ ছিল না। কারণ তাতে আগ্রহ ছিল না ভারতের। আর ভারতের যাতে আগ্রহ নেই তাতে মুজিবেরই বা আগ্রহ সৃষ্টি হয় কি করে? ২৩ মার্চের বৈঠকে মুজিবের ৬ দফা ইয়াহিয়া খান ও ভূট্টো উভয়ই মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু এরপরও মুজিবের আগ্রহ ছিল না পাকিস্তানের অখণ্ডতা নিয়ে আলোচনাকে আরো সামনে এগিয়ে নেয়ার। ছাত্রলীগের নেতারা ইয়াহিয়া খান ও ভূট্টোর সাথে মুজিবের বৈঠককে স্বাধীনতার চেতনাবিরোধী মনে করে। এবং তা নিয়ে আওয়ামী-বাকশালী শিবিরে কোন দ্বিমত নেই। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গঠন নিয়ে এজন্যই মুজিব আলোচনায় রাজী ছিল না। ফলে বৈঠক ভেঙ্গে যায়। কারণ ভারতীয় র'এবং ছাত্রলীগ নেতাদের গোলপোষ্ট তখন ভিন্ন। সেটি ৬ দফা নয়, বরং এক দফা তথা পাকিস্তান ভাঙ্গা। ইয়াহিয়া ও ভুট্টো সেটি বুঝতে পারে এবং মার্চের আলোচনা ব্যর্থ হয়।

কিন্তু এ বিষয়ে অতিশয় বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্গতি হলো তাদের,যারা মনে করে পাকিস্তান ভেঙ্গে গেছে স্রেফ স্বৈরাচারী ইয়াহিয়ার ভূলের কারণে। সে ভূলটি ছিল মুজিবের হাতে ক্ষমতা না দেয়া। যেন মুজিব ও তার দল পাকিস্তান রক্ষার জন্য দু*ই*পায়ে খাড়া ছিল! এবং মুজিবে হাতে ক্ষমতা দিলেই যেন পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়া থেকে বেঁচে থাকে! ভারত যে পাকিস্তান ভাঙ্গার ব্যাপারে কতটা আপোষহীন ছিল সেটি পরবর্তীতে আরো পরিস্কার হয়ে উঠে। শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য ইয়াহিয়া খান আন্তরিক ভাবেই চেষ্টা করেছিলেন। এমন কি যুদ্ধ এড়াতে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশ্নে গণভোটের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। ইয়াহিয়া খানের পক্ষে এর চেয়ে বেশী ছাড় দেয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু ভারত তাতে রাজী হয়নি। বরং সেটি হতে দেয়নি। এমন কি যে সব উদ্বাস্তু ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের ফেরতও আসতে দেয়নি। এব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন সেক্রেটারি অব স্টেট হেনরি কিসিন্‌জার লিখেছেন,

"Despite Yahya's proclamation of an amnesty India made the return of refugees to East Pakistan depend on a political

settlement there. But India reserved the right to define what constituted an acceptable political settlement on the sovereign territory of its neighbor." (The White House Years, page ৮৫৮).

অনুবাদঃ ইয়াহিয়া খানের পক্ষ থেকে একটি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শণের পরও ভারত বলছে উদ্বাস্তুদের পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যাওয়াটি নির্ভর করছে রাজনৈতিক মীমাংসার উপর। কিন্তু ভারত তার প্রতিবেশী দেশের সার্বভৌম সীমানার মধ্যে সে রাজনৈতিক মীমাংসাটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়টি তার নিজস্ব এখতিয়ারে রাখছে।

স্বৈরাচারী ব্যক্তির ক্ষমতায় আসা বা গণতন্ত্র-দুষমন দুর্বৃত্তদের রাজনীতির কর্ণধার হওয়া কোন দেশেই অসম্ভব কিছু নয়। বিশ্বের বহু দেশেই সেটি হয়। একাত্তরের পর বাংলাদেশেও সেটি বার বার হয়েছে। কিন্তু সে জন্য দেশপ্রেমিক নাগরিকগণ সে দেশের মানচিত্র ভাঙ্গায় হাত দেয় না। এমন কাজ একমাত্র বিদেশী দুশমনদের হাতেই হতে পারে। পাকিস্তানে গণতন্ত্র-বিরোধী ষড়যন্ত্র শুরু হয় দেশটির প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই। দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দল এরপরও ধৈর্যের সাথে দেশ গড়ার চেষ্ঠা করে গেছেন। প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে জনাব নাজিমুদ্দিন, জনাব মোহম্মদ আলী বগুড়া ও জনাব সোহরাওয়ার্দী অপসারিত হয়েছেন, সামরিক আইন জারি হয়েছে এবং দেশের শাসনতন্ত্রও রহিত হয়েছে। কিন্তু সেজন্য নাজিমুদ্দিন, মোহাম্মদ আলী বগুড়া, সোহরাওয়ার্দি বা অন্য কোন নেতাই পাকিস্তান ভাঙ্গার কাজে নামেননি। এমনকি চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ও নয়।তাতে দেশ বেঁচে গেছে। আর দেশ বাঁচলেই তো রাজনীতি বাঁচে। কিন্তু একাত্তরে দেশের রাজনীতি আর দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদদের হাতে থাকেনি। দেশ না বাঁচায় রাজনীতিও বাঁচেনি। ৪৪ বছর পরও বঙ্গীয় এ দেশে পঞ্চাশের বা ষাটের দশকে যে রাজনীতি ছিল সে রাজনীতি এখন আর জীবিত নাই। ১৯৫৪ বা ১৯৭০'য়ের নির্বাচনের ন্যায় কোন নির্বচনের কথা তাই ভাবাই যায়না। একাত্তরের পূর্ব থেকেই দেশ দখলে গেছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা "র" এবং "র" প্রতিপালিত এজেন্টদের হাতে। বি. রমনের বই The Kaoboys of the R&AW, Down Memory Lane' বা অশোক রায়না রচিত Inside R&AW সে কিচ্ছাতেই ভরপুর। ভারতের স্ট্রাটেজিক লক্ষ্য হলো, বিশ্বের দরবারে বৃহৎ শক্তির মর্যাদা লাভ।

সে কথার স্বীকারোক্তি এসেছে মি. রমনের বইতে। তিনি এক্ষেত্রে "র" এর ভূমিকার কথাও তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেনঃ

An emerging power such as India, which is aspiring to take its place by ২০২০ among the leading powers of the world, has to have an external intelligence agency which has the ability to see, hear, smell and feel far and near. (B. Ramon, ২০০৭).

অনুবাদঃ ভারতের মত একটি উদীয়মান শক্তি যা ২০২০সালের মধ্যেই নিজেকে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় শক্তিগুলোর মাঝে অন্তর্ভূক্ত করার আশা পোষণ করে তাকে অবশ্যই বৈদেশিক বিষয়ক এমন একটি গোয়েন্দা এজেন্সীর অধিকারি হতে হবে যার সামর্থ্য থাকবে দূরের বা নিকটের ঘটনাবলিকে দেখা, শ্রবন করা,ঘ্রাণ নেয়া ও অনুধাবন করার।

ভারতের স্বপ্ন ও স্ট্রাটেজী

১৯৬২ সালে চীনের হাতে অপমানজনক পরাজয়ের পর ভারতের বৃহৎ শক্তি রূপে বেড়ে উঠার স্বপ্নে প্রচণ্ড ভাটা পড়ে। এরপর ১৯৬৫ য়ে পাকিস্তান পরাজিত করতে না পারায় সে পুরোন অপমানের সাথে নতুন অপমান যোগ হয়। ভারত এরপর প্রচণ্ড ভাবে মনযোগী হয় পাকিস্তান ভাঙ্গার কাজে। তখন বিপুল বিনয়োগ হয় পাকিস্তানের অভ্যন্তরে পঞ্চম বাহিনী বা ট্রোজান হর্স গড়ে তোলার কাজে।শেখ মুজিব ও তার অনুসারিগণ মূলত ব্যবহৃত হয়েছেন সে লক্ষ্য পূরণে। তবে ভারতের লক্ষ্য নিছক পাকিস্তানকে শক্তিহীন করা নয়, সেটি হলো উপমহাদেশের মুসলিমদের শক্তিহীন করা। তাই একাত্তরে পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলেও ভারতীয় স্ট্রাটেজী শেষ হয়নি। তাই বর্তমান স্ট্রাটেজী বাংলাদেশকেও দুর্বল ও লাগাতর অধীনত রাখা। সে সাথে দুর্বল করা প্রতিবেশী নেপাল, ভূটান ও শ্রীলংকাকে। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষাকে দুর্বল করার লক্ষ্যেই একাত্তরে পাকিস্তান আর্মির ফেলে যাওয়া বহু হাজার কোটি টাকার অস্ত্র বাংলাদেশের আর্মির হাতে পোঁছতে দেয়নি। সেটি ছিল ভারতীয় পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্দ অংশ। প্রশ্ন হলো, একাত্তরে পূর্ব পাকিস্তানের যে পরিমান অস্ত্র মওজুদ ছিল,বাংলাদেশ সরকার কি আজও তা কিনতে পেরেছে? অথচ তা নিয়ে বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের মুখে সামান্যতম

ক্ষোভ নাই। ভারতীয় ট্রোজান হর্স বা পঞ্চম বাহিনীর লোকদের তা থাকার কথাও নয়।

ভারতের ভয়, পাকিস্তানের ন্যায় বাংলাদেশেরও যদি সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পায় তবে সে খড়গ একমাত্র তাদের ঘাড়েই পড়বে। তারা জানে বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে কোন গুলী নিক্ষিপ্ত হলে সেটি ভারত ছাড়া অন্য কোথাও পড়বে না। তাই বাংলাদেশ সৃষ্টির শুরু থেকেই ভারত অতি সতর্ক। ভারত চায়,বাংলাদেশ সরকারের নিঃশর্ত আনুগত্য। তাই ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদি হওয়াটাই অপরাধ। মুজিব এবং তার আওয়ামী লীগ সেটি ভাল করেই বোঝে। তাই দূর্নীতি দমন,গুম-খুন, চুরি-ডাকাতি,পদ্মা বা তিস্তার পানি, পদ্মা সেতু নির্মাণ বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে আওয়ামী বাকশালীদের মাথা ব্যাথা নেই। তাদের মূল এজেণ্ডা ভারত-বিরোধীদের নির্মূল।ভারতের পক্ষ থেকে এটিই তাদের উপর অর্পিত দায়ভার। গদীতে থাকার স্বার্থে তাদের মূল কাজটি ভারতে খুশি রাখা। একারণেই, ভারতে মুসলিম নিধন বা মসজিদ ধ্বংসর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীগণ কোন প্রতিবাদ করে না। নিশ্চুপ থাকে কাশ্মীরে ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ অধিকৃত কাশ্মীরকে বিতর্কিত এলাকা বললে কি হবে, আওয়ামী-বাকশালী মহলটি সেখানে ভারতীয় অধিকৃতিকেই জায়েজ বলে মেনে নেয়।

মার্কিনী রোষানল

১৯৬২'য়ের ১৩ অক্টোবর চীন ভারতকে কাশ্মীরের লাদাখ সীমান্ত থেকে তার সৈন্য অপসারণের দাবী করে।ভারত সে দাবী মেনে না নেয়ায় ১৯৬২ এর ২০ই অক্টোবরে হামলা করে।২০শে নবেম্বরের মধ্যে লাদাখ এলাকার দুই হাজার বর্গমাইল এবং তিব্বত সীমান্তের NEFA এলাকার প্রায় দেড় হাজার বর্গমাইল এলাকা দখল করে নেয়।২৮ শে অক্টোবর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ.কেনেডি আইয়ুব খানকে ভারতের সাহায্যে এগিয়ে আসতে বলে।কিন্তু তিনি তা করেননি।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে,চীন তখনও মার্কিন বিরোধীতার কারণে জাতিসংঘের সদস্য হতে পারেনি।পাকিস্তান সদস্য পদ লাভে চীনকে জোড়ালো সমর্থন করে।পেশোয়ারের কাছে ছিল সিআইয়ের গোপন ঘাঁটি,সেখান থেকে CIA U-২ গোয়েন্দা বিমান পাঠাতো রাশিয়ার অভ্যন্তরে।পাকিস্তান সে ঘাঁটিও বন্ধ করে

দেয়।এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচণ্ড ক্রোধ চাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে।অপর দিকে ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্তে যুদ্ধে চীনের হাতে পরাজয়ের পর ভারতও প্রতিশোধের পরিকল্পনা নেয়।এবং সেটি যতটা না চীনের বিরুদ্ধে তার চেয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে।পরিকল্পনা নেয় পাকিস্তানের অঙ্গহানির।আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা নেয় আইয়ুব খানের অপসারণের ও পাকিস্তানকে দুর্বল করার।-(মাসুদুল হক)।প্রখ্যাত গবেষক ও পররাষ্ট্র বিজ্ঞানী এবং পাকিস্তানের সাবেক মন্ত্রী জনাব জি.ডব্লিও.চৌধুরী তার বই "Last Days of United Pakistan" বইতে দেখিয়েছেন,পাকিস্তানের কপালে একাত্তরে যা কিছু ঘটেছে সেটি নিছক একটি নির্বাচনের ফলাফল ছিল না। ছিল তৎকালীন আন্তর্জাতিক স্নায়ুযুদ্ধের ফলাফল।তাতে যুক্ত ছিল নিছক ভারত নয়,সোভিয়েত রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও।

তখন র'এবং সি.আই.এ -উভয়েরই প্রয়োজন পড়ে পাকিস্তানের রাজনীতিতে তাদের পক্ষে নিজ খেলোয়াড়ের। সে স্থানটি পূরণ করে শেখ মুজিব। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই পাকিস্তানের রাজনীতির ময়দানে তাঁকে নিজেদের খেলোয়াড় রূপে বেছে নেয়। ১৯৬৬ সালের ৫ই ও ৬ই ফেব্রেয়ারিতে লাহোরে আইয়ুব বিরোধী দলসমুহের একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সে সম্মেলনে জনাব নুরুল আমীনের নেতৃত্বাধীন এনডিএফ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী এবং আওয়ামী লীগ যোগ দেয়। তখন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন পাঞ্জাবের নবাবজাদা জনাব নসরুল্লাহ খান। এ সভায় শেখ মুজিব হঠাৎ করেই ৬ দফা পেশ করেন। এমনকি আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছেও বিষয়টি বিস্ময়ের জন্ম দেয়। সাংবাদিক মাসুদুল হকের কাছে এক সাক্ষাৎকারে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, "লাহোর যাত্রার প্রাক্কালে এমনকি লাহোরে গিয়েও এ সম্পর্কে মুজিব আমাদের সঙ্গে আলাপ করেননি। আমরা জানতাম না মুজিব এ ধরনের প্রস্তাব তুলবে।" -(মাসুদুল হক)

রহস্যময় ৬ দফা

ষাটের দশকের মাঝামাঝিতে আওয়ামী লীগ ৬ দফাপন্থী এবং ৬ দফা বিরোধী দুই খন্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৭ জেলার মধ্যে ১৪ জেলা সভাপতি ৬ দফার

বিরোধীতা করে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে। কিন্তু কে এবং কিভাবে ৬ দফা রচনা সে রহস্যের আজও সমাধা হয়নি। পাকিস্তানের গোয়ান্দা বিভাগ ডিআইবি এটিকে সিআইয়ের চাল হিসাবে মনে করে। ভাষানীপন্থী ন্যাপও সেটিই মনে করে। সে সময় ঢাকায় মার্কিন কনস্যাল জেনারেল ছিলেন মিস্টার ব্রাউন। তিনি একই সাথে সিআইয়ের স্টেশন চীফেরও দায়িত্ব পালন করছিলেন। তার সাথে শেখ মুজিব ও ছাত্রলীগের একাংশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সে সময় মার্কিন কনসালে আরেক কর্মকর্তা ছিলেন কর্নেল চিশহোস।

চিশহোসের বাসায় মাঝে মাঝে পার্টি দেয়া হত। এসব পার্টিতে বাছাই করা রাজনৈতিক নেতা, ছাত্র নেতা ও পদস্থ বাঙালী কর্মকর্তাদের দাওয়াত দেয়া হত। এভাবে একদিকে ভারতীয় 'র'এর তৎপরতা যেমন চরম আকার ধারণা করেছিল,তেমনি তৎপরতা বেড়েছিল মার্কিন সিআইয়ের। পরে পাকিস্তান সরকার কর্নেল চিশহোসকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে এবং দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেয়। পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার পদস্থ কর্মকর্তা এ,টি,এস,সফদর জানান, শেখ মুজিব তাকে বলেছিলেন তেজগাঁও বিমান বন্দরে লাহোরগামী বিমানে উঠার আগে ৬ দফা প্রস্তাবের একটি টাইপ করা কপি রুহুল কুদ্দুস নামে একজন সিএসপি অফিসার তার হাতে তুলে দেন। উল্লেখ্য যে, রুহুল কুদ্দুস ছিলেন আগরতলা মামলার একজন আসামী এবং শেখ মুজিবের ইনার সার্কেলের লোক।-(মাসুদুল হক)।

সাপ্তাহিক মেঘনার (১৬/১২/৮৫) সাথে এক সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আব্দুল মালেক উকিল বলেন, ৬ দফা তিনি প্রথম দেখেন একটি টাইপকরা কাগজে শেখ মুজিবের পকেটে ১৯৬৬ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় কনভেনশনে যাওয়ার পথে। বাংলাদেশের ইতিহাসে ৬ দফা হলো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একাত্তরের ঘটনাবলী, পাকিস্তান ভাঙ্গা ও বাংলাদেশের সৃষ্টি - এসবের শুরু হয় মূলত ৬ দফা থেকে। অথচ এটির প্রণয়নে শেখ মুজিব নিজ দলের নেতাদের সাথেও কোনরূপ পরামর্শ করেননি। ৬ দফা প্রণয়নের প্রাক্কালে কোন দলীয় সম্মেলন বা পরামর্শ সভাও হয়নি। অথচ গণতান্ত্রিক রাজনীতির সেটিই প্রথাসিদ্ধ রীতি। কিন্তু সেটি প্রণিত হয় রুহুল কুদ্দুসের ন্যায় একজন সন্দেহভাজন চরিত্রের মানুষের দ্বারা যিনি বিদেশী শক্তির বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে বহু পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিলেন।

কোন পরিকল্পনা যখন বিদেশী ষড়যন্ত্রের অংশ রূপে অগ্রসর হয় তখন সে ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমুহ কখনোই প্রকাশ্যে নেয়া হয় না। দেশবাসীকে ও দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সে প্রক্রিয়ায় জড়িত করা হয় না। সেটি ৬ দফা প্রণয়নের সময় যেমন হয়নি, তেমনি পাকিস্তান ভাঙ্গার ব্যাপারেও হয়নি। অথচ পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহিত হয়েছিল প্রকাশ্য জনসভায়। তার সাথে সম্পৃক্ত ছিল মুসলিম লীগের সর্বভারতীয় নেতাকর্মীগণ। অথচ বাংলাদেশের ইতিহাসে ৬ দফা প্রণয়ন ও পাকিস্তান ভাঙ্গার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরেও কোন প্রকাশ্য বৈঠক হয়নি।

ইতিহাসের লেখকদের দায়িত্ব হলো, এসব সিদ্ধান্তের গুঢ় রহস্যগুলি উদঘাটন করা। কারা ছিল নেপথ্যের নায়ক বা ভিলেন তাদের খুঁজে বের করা এবং সত্য থেকে মিথ্যাগুলোকে সতর্কতার সাথে আলাদা করা। বাংলাদেশে ইতিহাসের লেখকদের দ্বারা একাজটিও হয়নি। তারা বরং অতি পরিচিত মিথ্যাগুলোকেও পাঠ্য তালিকাভুক্ত করেছে। এভাবে মিথ্যাচর্চাও ইতিহাসের পাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং 'র'

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী একটি যুদ্ধের প্রস্তুতিতে র'য়ের কি ভূমিকা ছিল -সে বিষয়ে আরো কিছু তথ্য দিয়েছেন ভারতীয় সাংবাদিক অশোক রায়না তার "Inside RAW" বইতে। সেটি এরকমঃ...কিন্তু ততদিনে ভারতীয় এজেন্টরা পূর্ব পাকিস্তানের মুজিবপন্থী একটি অংশের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। আগরতলায় ১৯৬২-৬৩ সালে ভারতীয় এজেন্ট ও মুজিবপন্থীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পরবর্তী গৃহিত কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। কর্নেল মেনন (ইনি হলেন ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা র'এর দিল্লিস্থ পাকিস্তান ডেস্কের দায়িত্বশীল। তার আসল নাম কর্নেল শংকর নায়ার। মেনন তার ছদ্দ নাম) যিনি ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনী ও মুজিবপন্থী অংশের যোগাযোগ রক্ষাকারী ছিলেন। তিনি আগরতলা বৈঠকের পর ইঙ্গিত পান যে, মুজিবপন্থী গ্রুপ আন্দোলন শুরু করার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব। কর্নেল মেনন তাদের এই বলে সতর্ক করে দেন যে, তার সঠিক ফলদায়ক সিদ্ধান্তে আসার সময় এখনো হয়নি।.. তারা অস্ত্রের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে এবং ঢাকাস্থ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস অস্ত্রাগারে হামালা চালায়। কিন্তু এই প্রাথমিক প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আসলে এই পদক্ষেপ একটি

ধ্বংসাত্মক ফলাফল ডেকে আনে, ঠিক যেরূপ কর্নেল মেনন ধারণা করেছিলেন। এর কয়েক মাস পর ৬ই জানুয়ারি ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে যে, ভারতের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করার চক্রান্ত করার জন্য ২৮ জন পাকিস্তানীর বিচার করা হবে। শেখ মুজিবকেও বারদিন পর একজন দোষী হিসাবে জড়িত করা হয়। এই মামলাই পরবর্তীতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হিসাবে পরিচিত পায়।-(অশোকা রায়না, ১৯৯৬)

২৫শে মার্চের বহু পূর্ব থেকেই ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা র' মুজিব বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল। যারা মনে করেন,পাকিস্তান আর্মির মিলিটারি এ্যাকশনের পরই মুজিব স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার সিদ্ধান্ত নেন -তাদের ধারণা আদৌ সত্য নয়। অশোক রায়না লিখেছেন, "কর্নেল মেননের অবিরাম ভ্রমন ও যোগাযোগের জন্য সীমান্তব্যাপী র'য়ের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র খোলা হয় এবং কর্নেল মেননের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের ভিতরের প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের নিবিড় যোগাযোগ ঐ সমস্ত তরুণ, অবিশ্রান্ত ও উৎসর্গীকৃত গুপ্ত যোদ্ধাদের মনোবল দারুণ ভাবে বৃদ্ধি করে। ... ইতিমধ্যে যখন বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপন শেষ হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের এজেন্টদের মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু হয়, তখনই সেই ভয়াবহ 'কালো রাত্রী'(২৫ শে মার্চ)'র পদধ্বনি শোনা যেতে থাকে।- (অশোক রায়না, ১৯৯৬)।একাত্তরের যুদ্ধটির শুরু তাই একাত্তরে নয়, শুরুটি হয়েছিল বহু পূর্ব থেকেই। তবে সব সময়ই এর পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিল ভারত। এবং মার্কিন কর্তৃপক্ষ ও তার গুপ্তচর সংস্থা তা থেকে অজ্ঞ ছিল না। তবে অজ্ঞ রাখা হয়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে। প্রতিটি ষড়যন্ত্রে তো তাই হয়ে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জি

মাসুদুল হক; বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ,মৌল প্রকাশনী ৩৮/২ক, বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।

অলি আহাদ; জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি: ১২৫,মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০।

B.Ramon, ২০০৭; The Kaoboys of the R&AW, Down Memory Lane, Lance Publishers & Distributors ২/৪২ Sarvapriya Vihar, New Delhi ১১০১৬.

অশোকা রায়না,১৯৯৬; ইনসাইড র'ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার অজানা অধ্যায়, (বাংলা অনুবাদ) অনুবাদ,লেঃ (অবঃ) আবু রুশদ রুমী প্রকাশনী।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮৫৬৩